অপগত হয় না। শরতের শেষভাগে যখন বর্ষাবাদলের কোন সম্ভাবনা থাকে না, সেই সময় দুর্গাপূজার বিধি আছে। এখন বঙ্গদেশের দেখাদেখি এবং দেশ-বিদেশে বঙ্গবাসীর ছড়াইয়া পড়িবার কারণে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কোন কোন স্থানে এখানকার অনুরূপ দুর্গাপূজা রপ্তানি হইয়া গিয়াছে। এমন কি, সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম যে, বিলাতেও একবার জনকয়েক বাঙ্গালী মিলিয়া দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; এবং বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময়ে মেসোপটেমিয়া প্রবাসী ভারতীয়গণ বহু আড়ম্বর সহকারে এই দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। পূজ্যপাদ ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসী বন্ধুবান্ধবের নিকট শুনিয়াছি যে, এক বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারতের কুত্রাপি মূর্ত্তি গড়িয়া দুর্গাপূজার ব্যবস্থা নাই।

এই পূজা উপলক্ষে চণ্ডীপাঠের বিধান আছে। চণ্ডী পাঠ করিলে এবং বঙ্গদেশে দুর্গাপূজার বিশেষ প্রচলন আলোচনা করিয়া দেখিলে ইহার মূল যে ঐতিহাসিক কোন ভিত্তি আছে, তাহা না মনে করিয়া থাকা যায় না। মনে হয়, বঙ্গদেশের ইতিহাস সুসম্বদ্ধরূপে লিপিবদ্ধ হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন এক যুগে—সম্ভবত বৌদ্ধযুগের অবসান-কালে—বর্ষাপগমে এক ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, সেই যুদ্ধে দুর্গানাম্নী কোন বীররমণী অবতীর্ণ হইয়া শত্রুপক্ষকে বিধ্বস্ত করিয়া দেশকে দুর্গতি ও বিনাশের কবল হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই কারণে সম্ভবত দুর্গা শব্দের দুর্গতিনাশিনী অর্থ করিয়া উহা ঐ শব্দের ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ বলিয়া প্রচার করা হইল।

দুর্গার আবির্ভাবকালে বোধ হয় দেশে বীরপুরুষের বড়ই অভাব ঘটিয়াছিল। সেই কারণে স্বদেশের রক্ষয়িত্রী দুর্গাদেবী জনসাধারণের দৃষ্টিতে মহিমা ও জ্যোতিপূর্ণ এক অসাধারণ ব্যক্তিরূপে (outstanding personality) প্রতিভাত হইয়াছিলেন; এবং সেই অবধি তিনি হিন্দু-সাধারণের অন্তরের পূজা পাইয়া আসিতেছেন। অনু-সন্ধান করিলে বঙ্গদেশে বীর রমণীর সন্ধান পাওয়া দুঃসাধ্য হইবে না। আমি বাল্যকালে শুনিয়াছিলাম যে, বাঁশ-বেড়িয়া গ্রামস্থ আমার এক মাসীর বাড়ীতে একবার ডাকাত পড়িয়াছিল। ডাকাতেরা সংখ্যায় বারোজন ছিল। মাসীর বাড়ীতে এবং তাহার চতুঃপার্শ্বে সাহসী পুরুষ কেহই ছিল না। সে কালের কথা—তখন ডাকাত পড়িয়াছে শুনিলে স্ত্রীলোকের কথা দূরে থাক, পুরুষেরাও কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া যাইত, তাহার কোনই ঠিকানা থাকিত না। আমার মাসী কালবিলম্ব না করিয়া এক-খানি খাঁড়া হস্তে ডাকাতদিগের সম্মুখীন হইলেন। ডাকাতেরা তাঁহার সেই চণ্ডীমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে ভয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল। এই সেদিন ঢাকায় হিন্দুমুসলমান দাঙ্গার সময়ে এক হিন্দু বালিকা যে অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি যে হিন্দুসাধারণের পূজার পাত্র হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমান-যুগে বঙ্গদেশ সমগ্রভাবে বিপক্ষহস্ত হইতে কোন এক মহিলা কর্ত্তৃক রক্ষিত হয় নাই বলিয়া দুর্গাদেবীর পর আর কোন রমণীর বিস্তৃত-ভাবে পূজা দেশবাসীর মধ্যে প্রচলিত হয় নাই।

দুর্গাদেবী সিংহবাহিনী। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, তাঁহার ধ্বজার চিহ্ন ছিল সিংহ। দুর্গাদেবী মহিষমর্দ্দিনী বলিয়া বিখ্যাত; একসময় তৈমুরলঙ্গ যে প্রকার মোগলভূমি হইতে ভারতে নামিয়া লুটপাটের দ্বারা ভারতভূমিকে উৎসন্নদশায় আনিবার উপক্রম করিয়া-ছিলেন, সম্ভবতঃ সেইরূপ মহিষ নামক কোন দুর্দ্দান্ত অসুরধর্ম্মী ব্যক্তি সুখশান্তিময় বঙ্গদেশে নামিয়া বঙ্গভূমিকে নিতান্তই বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছিল। আমাদের অনুমান হয়, সম্ভবত এই মহিষাসুর তিব্বত বা ভূটান প্রভৃতি বঙ্গদেশের উত্তরাংশস্থিত কোন এক দেশ হইতে আসিয়াছিল। এই মহিষাসুরকে সমূলে বিধ্বস্ত করিয়া ফ্রান্সের বীর রমণী Joan of Arc এর ন্যায় সকলের সম্মুখে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন। দুর্গাদেবীকে দশভূজা বলাতে সুস্পষ্ট বোঝা যায়, চতুর্দ্দিকে তাঁহার কিরূপ ক্ষিপ্র গতি ছিল। তিনি কেবল মহিষাসুরকে বধ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, কিন্তু বিপক্ষের আক্রমণ হইতে সকল দিকই সুরক্ষিত করিয়াছিলেন।

দুর্গাপূজার পূর্ব্বদিনে "কলাবউ" স্নান করান হয়। ভাগীরথী-বিধৌত বঙ্গের সমতল ভূমিতে সহজলভ্য আহার্য্যাদির প্রাচুর্য্যের ফলে উর্ব্বরমস্তিষ্কে কল্পনার সাহায্যে মূল সত্য কিরূপ বিকৃত আকার ধারণ করিতে পারে, "কলাবউ"-স্নানের বিধানে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। "কলা" শব্দের প্রকৃত অর্থে আমরা "চতুঃষষ্টি কলা" বা চৌষট্টি প্রকার বিদ্যা প্রাপ্ত হই। অনুমান হয় যে দুর্গাদেবী ঐ চৌষট্টি প্রকার বিদ্যার মধ্যে অনেকগুলিতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। সেকালে বিদ্যাচর্চ্চা করিতে হইলে স্নান করিয়া পূতবেশে পবিত্র হৃদয়ে নিত্য পাঠারম্ভ করিতে হইত; অনুমান হয় কোন এক কুক্ষণে কোন এক মহাপণ্ডিত (?) এই বিষয়ের ভাবগ্রহে অসমর্থ হইয়া অথবা নিজের পাণ্ডিত্য ফলাইবার চেষ্টায় বঙ্গদেশে অত্যন্ত সুলভ কলাবৃক্ষকে কলাবিদ্যার স্থানে বসাইয়া এবং তাহাকে বধূরূপে কল্পনা করিয়া তাহার স্নানের বিধান দিয়াছিলেন। বোধ হয় কদলীবৃক্ষের শীতলতা প্রভৃতি গুণ এবং তাহার ফলের সুখভোগ্যতা

তাঁহাকে কদলীবৃক্ষেরই প্রতি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। দুর্গাদেবী নিজেও যেরূপ বিদুষী ছিলেন, অনুমান হয়, তিনি কোন বিদ্বান পুত্রেরও জননী ছিলেন। এই পুত্র যে সেকালে নানা বিদ্যায় বিভূষিত ছিলেন, তাহাই বুঝাইবার জন্য তাঁহার পুত্রকে বেদব্যাসরচিত মহাভারতের লেখক সুপণ্ডিত গণেশের সহিত এক করিয়া তাঁহাকে গণেশজননী বলা হইয়াছে। হইতে পারে যে, দুর্গাদেবীর পুত্র বহুবিদ্যায় বিশারদ ছিলেন এবং বিদ্যাচর্চ্চায় একান্ত অনুরক্ত ছিলেন বলিয়াই তাঁহারই উদ্দেশে "কলা" বধূরূপে কল্পিত হইয়াছিল।

দুর্গাপূজার সঙ্গে কলাবৃক্ষকে সংযুক্ত করিবার আর একটী কারণ মনে হয়, দুর্গাদেবী সম্ভবতঃ কলাবৃক্ষকে বঙ্গদেশে আমদানী করিয়াছিলেন, অথবা তাহার চাষ বহুবিস্তৃতরূপে বঙ্গদেশে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। আমাদের মনে হয় যে, তিনি কেবল কলাবৃক্ষের চাষই প্রবর্ত্তন করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, কিন্তু সর্ব্বশুদ্ধ নয়টী জিনিসের যথা,—কচু, রম্ভা, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিল্ব, দাড়িম, অশোক, মান ও ধানের চাষ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। ইহারই জন্য এই নয়টী বস্তু কলাবৃক্ষের সহিত বাঁধিয়া নিয়া স্নান করান হয়, ইহারই নাম "নবপত্রিকা"। মনে হয়, শরৎকালে এই কয়েকটী বৃক্ষেরই পত্র বিশেষভাবে নব উদ্গত হয় বলিয়াই সংক্ষেপে ইহাদের নামকরণ করা হইয়াছে "নবপত্রিকা"।

সুন্দরবনে কয়েকদিন।

(৩)

(শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ এম-এ, পি-আর, এস)

ভোরবেলা উঠিয়া খানিকটা বেড়াইয়া আসিয়া স্নান করিয়া লইলাম। আজ আমরা যাইবার জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছিলাম—সে নৌকায় বা পাল্কীতে বা হাঁটিয়া, যাহা করিয়াই হউক। শেষকালে ঠিক হইল যে, আমরা ছেলেরা কয়েকজন আগেই একখানি নৌকা করিয়া যাত্রা করিব, পরে আর একখানিতে গুরুজনরা আসিবেন। আমরা তিনজনে প্রায় দশটার সময় ওনং লাটের দিকে রওনা হইলাম। একবার যাইতে যাইতে পিছন ফিরিয়া শেষ দেখা দেখিয়া লইলাম,—সেই ধানের ক্ষেত ও অসংখ্য মরাই, সেই বৃক্ষকুঞ্জে ঢাকা কুটীর ও কাছারী বাড়ী, তাহার সামনে কলাগাছে ঘেরা আমাদের প্রিয় পুষ্করিণী। আমরা বাঁধের উপর দিয়া বরাবর চলিতে লাগিলাম। বর্ষাকালে খালের নোনাজল পাছে জমি নষ্ট করিয়া দেয়, সেইজন্য বাঁধ না দিলে এখানে চাষ হইবার উপায় নাই। একবার বাঁধ ভাঙ্গিলেই সব গেল। ওনং লাটে পৌছাইয়া আমরা খাইয়া লইলাম। এখানকার দৃশ্য আরও পরিষ্কার, গাছপালা খুব কমই আছে। যেদিকে তাকাই সে দিকেই চক্রবালরেখার শেষসীমা পর্য্যন্ত ধূ—ধূ করিতেছে অনন্ত মাঠ; মাঝে মাঝে কেবল কৃষকদের কুটীর আর ধানের স্তূপগুলি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। রৌদ্র ক্রমেই প্রখর হইতে লাগিল। ১২টার সময় জোয়ার আসিলে আমরা নৌকায় জিনিসপত্র উঠাইয়া নিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিলাম। ভরা জোয়ারের জল টলমল করিতেছিল। তাহার উপর সূর্য্যকিরণ পড়িয়া চিক্‌মিক্ করিতেছিল—সবুজ জলের উপর রজতশুভ্র রশ্মির চপল খেলা বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। মাঝিরা ছাড়া আমরা নৌকায় ছিলাম—ওরা পাঁচ ভাই ও চাকর গোকুল। গুরুজনরা বা মেয়েরা কেউই ছিলেন না, কোনও গণ্ডগোল-বাধা কিছুই নাই; কাজেই বেশ ফুর্ত্তি করিতে করিতে যাওয়া যাইবে। চার ভাই মিলিয়া দাবা খেলিতে লাগিল, আমি বাকীটার সঙ্গে ছইএর বাহিরে মুখ বাড়াইয়া গল্প জুড়িয়া দিলাম। গল্প হইতে হইতে আমরা গুভাকাটার খাল ছাড়াইয়া দুর্ব্বাচটীর কাছাকাছি আসিয়া পড়িলাম। ওরা বাঁশী শুনিতে চাহিল, আমি কতকগুলি সুর বাজাইলাম। আর একখানি নৌকার এখনও দেখা নাই। চরের উপর ছোট-বড় বিস্তর কুমীর শুইয়া আছে দেখিলাম—তাহারা দিব্য আরামে রৌদ্র পোহাইতেছিল। বন্দুক থাকিলে একবার পরীক্ষা করা যাইত বলিয়া ওরা আপশোষ করিতে লাগিল। দিনমণি যতই অস্তাচলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই আমরা বড়গাঙ্গের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমি ইত্যবসরে আমাদের বুড়া মাঝি, তীরের ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া পাতাওয়ালা লম্বা সুঁদরী গাছগুলির (যাহা হইতে নাম হইয়াছে সুন্দরবন) ও আমাদের অগ্রে ও পশ্চাতে পালতোলা নৌকাগুলির sketch করিয়া লইলাম। ক্রমে আমরা বড় গাঙ্গে আসিয়া পড়িলাম। দূরে নামখানায় ষ্টীমারের ধোঁয়া দেখা যাইতে লাগিল। তখন সন্ধ্যাসূর্য্যের কোমল আলোকে জলস্থল চারিদিক অপূর্ব্ব আভায় উদ্ভাসিত। সত্য সত্যই মনে হইতেছিল—"দেখি নাই—কভু দেখি নাই, এমন তরণী বাওয়া!" সেই অপরূপ বাহ্যদৃশ্য অন্তরের কাছে আরও মনোরম হইয়া উঠিয়াছিল, আমাদের বুড়া মাঝির সরস রসিকতায়। তাহার একএকটা বুলির দাম হাজার টাকা। আমরা যখন সপ্তমুখীর সঙ্গমে আসিয়া পড়িলাম, তখন পশ্চিমা-

কাশে রাঙ্গা রঙের আগুন লাগিয়াছে, আর সেই আগুন প্রতিফলিত হইতেছে সবুজ জলের অনন্ত উদার বক্ষে। যে দিকেই তাকাই কোনও সীমা নাই। উপরে রঙের স্বপনভরা বিচিত্র আকাশ আর নীচে অপার অনন্ত বারি রাশি। মাঝখানে আমাদের ক্ষুদ্র তরণীখানি পাল তুলিয়া জলকে তরঙ্গায়িত করিয়া মহানন্দে ছুটিয়াছে। সেই অসীমত্ব প্রাণে আনিয়া দেয় এক অনির্ব্বচনীয় আবেশ, এক অজানা বেদনা। তখন সত্য সত্যই মন "ফেলে যেতে চায় এই কিনারায় সব চাওয়া সব পাওয়া"। বাঁশীর সুমিষ্ট লহরীর সঙ্গে হৃদয় অপূর্ব্ব সুরে ভরিয়া উঠে, এবং আপনা আপনিই গাহিয়া উঠে—

"কোথায় আপনা ভুলে এসেছি কোথায়
হিয়া মাঝে যেন কার ডাক শুনা যায়
কি যেন কি মোহাবেশে
কোথায় এসেছি ভেসে
ধু—ধু করে দুই পাশে
বিজন বেলায়।"

এই রকম কত ভাব, কল্পনা কত আবেগ যে চিত্ত-পটে উঠিয়া আবার মিলাইয়া যায়—রেখে যায় শুধু একটা উদার উদাস প্রেরণা. এই অনন্ত ভুমা মহানের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলার আকুল বাসনা। কাল-জলে নিশির নৃত্য পিছনে ফেলিয়া যখন আমাদের নৌকা-খানি :সেই বিশাল জলরাশি হইতে নামখানার খালে ঢুকিতেছিল, তখন সেই সন্ধ্যা-আঁধার-আচ্ছন্ন অনন্ত জলধির কাছে আমরা সমস্বরে শেষ বিদায় লইলাম। এই সুদূর বিজনে, প্রকৃতির লুকানো শোভার মধ্যে আমাদের জয়ধ্বনি আকাশ বাতাস, জল স্থল কম্পিত করিয়া পাশের নৌকাগুলিকে চমকিত করিল। গভীর নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বাঙ্গলার সুজলা সুফলা মূর্ত্তি-বন্দনা, বাঙ্গালীর চির আরাধ্য দেশমাতৃকার জয়ধ্বনি ধীরে ধীরে অনন্তে মিলাইয়া গেল।

খালের দুই পাশে সারি সারি নৌকা বাঁধা রহিয়াছে, তাহাদের ভিতর হইতে আলোগুলি মিট্‌মিট্ করিয়া উঁকি মারিতেছে; কেবল আমাদের নৌকাখানিই অবিরাম চলিয়াছে। গান গা হয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িতেছিলাম, তাই বাঁশীটি তুলিয়া লইলাম। ঘন কুয়াসায় দেখিতে না পাইয়া একবার আমাদের নৌকার সঙ্গে আর একখানি তীরে বাঁধা নৌকার ধাক্কা লাগিল। তাহার ভিতরের লোকেরা বেশ নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছিল। হঠাৎ এইরূপভাবে ধাক্কা খাইয়া তাহাদের নিদ্রা ছুটিয়া গেল এবং একটা কি ভয়ানক ব্যাপার হইয়াছে মনে করিয়া সকলে মিলিয়া ভীষণ গণ্ডগোল বাধাইয়া দিল। পরে আসল খবর পাইয়া আশ্বস্ত হইল; কোনও পক্ষেরই কোনও ক্ষতি হয় নাই। ক্রমে ক্রমে গল্প :করিতে করিতে আমাদের নৌকার সকলেও একে একে ঘুমাইয়া পড়িল—কেবল-মাত্র আমি জাগিয়া। বসিয়া বসিয়া আর কি করি, পকেট হইতে কাগজ পেন্সিল লইয়া লিখিতে লাগিলাম:—

"নৌকায় চলেছি। সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে, কেবল আমি ও মাঝিরা জাগ্রত। বাহিরে ঘোর অন্ধকার, তীরের বন সেই অন্ধকারকে আরও ঘনিয়ে তুলে এক গভীর তমসার সৃষ্টি করেছে। কাস্তের ফলার মত দ্বিতীয়ার চাঁদ কিছুক্ষণের জন্য নদীর জলের উপর আপনার রজত রশ্মি প্রতিফলিত করে আবার ডুবে গেছে। এখন চরিদিকে জমাট কুয়াসা আমাদের ঘিরে আছে, কেবল তারাগুলি ঝিক্‌মিক্ করছে। বাইরে কোথাও জন-প্রাণীর সাড়া নেই, সব নীরব নিস্তব্ধ। দাঁড়ের ঝুপ্‌ঝাপ্ শব্দে, নিঝুম রাতে প্রকৃতির এই ঘোমটা টানা প্রশান্ত মূর্ত্তিকে স্পন্দিত করে আমাদের নৌকাখানি ধীরে ধীরে চলেছে—বাহিরে ভিতরে সব চুপচাপ। মাঝে মাঝে কচিৎ কখনও একখানা তীরে বাঁধা নৌকার সঙ্গে দেখা হচ্ছে। মাঝ গাঙ্গে বাঁধা আলোকসজ্জায় সজ্জিত সুবিন্যস্ত ষ্টীমারগুলি দেখে মনে হচ্ছে কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা লোভনীয়—এই স্বদেশী নৌকা না ঐ আড়ম্বর-পূর্ণ বিদেশী জাহাজ? পরক্ষণেই আবার মনে হল, কবি বলে গেছেন—

"যদি দেয় স্বরগের সুখে
তবু শ্লাঘ্য নহে স্ববশের দুখে॥"

বাঁশী বাজিয়ে বাজিয়ে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছি—বাঁশী আমার বুকের উপর ঘুমিয়ে আছে। প্রাণে এক অননুভূত ভাব ছেয়ে ফেলেছে। অনন্ত আশা ও উৎকণ্ঠা নিয়ে চলেছি, জানিনা কি সংবাদ সেথানে প্রতীক্ষা করছে। আশঙ্কায় হৃদয় দুরু দুরু কেঁপে উঠছে, জানিনা গিয়ে কি শুনব, কি দেখব, কি বলব। নানা-রকম চিন্তা মনকে আলোড়িত করছে, মথিত করছে।" এরকম অবস্থায় কতক্ষণ কাটাইয়া দিলাম। অবশেষে আমরা কাকদ্বীপে পৌছিলাম, তখন রাত প্রায় বারটা। গোকুল বাজারে যাইয়া মুড়ি ও মিষ্টান্ন কিনিয়া আনিল, সেগুলি আনন্দে উদরসাৎ করিয়া নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে আশ্রয় লওয়া গেল।

ভোর না হইতেই, কাকদ্বীপের কাক না ডাকিতেই আমরা নৌকা হইতে তীরে নামিলাম। প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, লোনা জলে মুখ-হাত-পা ধুইয়া, গঙ্গার অনন্ত প্রসারিত বক্ষে তরুণ অরুণের সোনার জাল বিস্তার দেখিয়া, জোয়ারভাটার কাদার মধ্যে ছুটাছুটী করিয়া আমরা আবার

নৌকায় উঠিলাম। এইরূপ চিত্তাকর্ষক বিপুল উন্মুক্ততার মাঝখানে এই রকম নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ আর বোধ হয় হইবে না। চারি পাশে কত অসংখ্য নৌকা বাঁধা ছিল, কেহ বা যাত্রী লইতেছে, কেহ মাল তুলিতেছে, কেহ বা ভরাপালে ছুটিয়া চলিয়াছে—আমি বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে তাহাদের গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। জোয়ার আসিলে আমাদের নৌকা ছাড়িয়া আবার অকূল বারিসমুদ্রে ভাসিয়া চলিলাম। ওদিকে রান্নার আয়োজন হইতে লাগিল। বাজার হইতে যাহা কিছু চাল-ডাল পাওয়া গিয়াছিল, গোকুল তাহাতে খিচুড়ী চড়াইয়া দিল। আমরা বাঁশী বাজাইয়া গল্প করিয়া সময়টা কটাইয়া দিলাম। অবশেষে রান্না শেষ হইলে শুধু গরম গরম খিচুড়ী আর আলু ভাতে দিয়া চমৎকার খাওয়া গেল। পুণ্যতোয়া গঙ্গাবক্ষে অসীম জলধির মাঝখানে নৃত্যশীলা তরণীর উপরে সে কি পরিতৃপ্ত ভোজন—সে আর লেখনীতে প্রকাশ হয় না। ক্ষুধায় সকলেরই পিত্ত জলিয়া যাইতেছিল··· খিচুড়ী সিদ্ধ হইতে আর দেরী সহিল না। সে কি উল্লাস, কি স্ফূর্ত্তি। গুরুজনেরা ত আর কেউ ছিলেন না সাবধান বা বারণ করিবার জন্য। যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাই করিতেছিল। কি মজাই হইতেছিল! আমাদের মধ্যে একজনের জলে ভয়ানক ভয়। সে যতই বারণ করিতেছিল আমরা দুষ্টামি করিয়া নৌকাটী ততই দোলাইতেছিলাম এবং মাঝিকে বলিতেছিলাম মাঝগাঙ্গ দিয়া চলিতে; শেষে যখন জাহাজের বড় বড় ঢেউগুলি নৌকাকে ধাক্কা দিতে লাগিল আর আমাদের নৌকাখানি হালকা পালকের মত উচু নীচু হইয়া ভীষণভাবে দুলিতে লাগিল, তখন বেচারা মুখ শুকাইয়া নৌকা আঁকড়াইয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু আমার যদিও এই প্রথম নৌকা চড়া, তবুও মোটেই ভয় করিতেছিল না। আমার বড় আনন্দ হইতেছিল। যাইতে যাইতে দেখিলাম অনেক প্রকাণ্ড জাহাজ কলিকাতায় যাইতেছে। তাহারা অপর কিনারা দিয়া যাইতেছিল। এখানে গঙ্গা প্রায় পাঁচ ছয় মাইল চওড়া হইবে—এপার-ওপার দেখা কঠিন। এই গাঙ্গে যখন তুফান উঠে তখন না জানি কি ব্যাপার হয়! আমি সমস্তক্ষণ দাঁড়াইয়া সেই বিরাট রূপ আস্বাদন করিতেছিলাম, আর জলের উপর সূর্য্যকিরণের অপূর্ব্ব খেলা দেখিতেছিলাম। আমরা যখন ডায়মণ্ডহারবারে পৌছিলাম, তখন বেলা আড়াইটা। গঙ্গার কাছ থেকে বিদায় লইয়া আমরা তীরে উঠিলাম, উঠিয়া বরাবর রেল-ষ্টেষণে গেলাম। চব্বিশ ঘণ্টার উপর নৌকায় কাটাইয়া আবার আমরা ডাঙ্গার মানুষ ডাঙ্গায় ফিরিলাম।

মনে হইতেছিল যেন প্রকৃতির কোন অজানা অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া আবার সভ্যতার মধ্যে ফিরিয়া আসিলাম। ষ্টেষণে পৌছাইয়া দেখি আড়াইটার একখানি ট্রেণ ছিল, কয়লার খনিতে ধর্ম্মঘট হওয়ায় সেখানি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। একটা খবর শুনিলাম, ধর্ম্মঘট উপলক্ষে স্বামী বিশ্বানন্দকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। বাড়ী যাইবার জন্য, সব খবর শুনিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল—আর ভাল লাগিতেছিল না। কিছু লুচী-তরকারী খাইয়া আমরা পাঁচটার সময় গাড়ীতে উঠিলাম; ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। গাড়ীর সংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় ভয়ানক ভীড় হইয়াছিল। সহযাত্রী এক ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হইল; তাঁহার নিকট হইতে কংগ্রেসের অধিবেশন, কলিকাতায় যুবরাজের আগমন প্রভৃতি অন্যান্য খবর পাইয়া প্রাণটা ঠাণ্ডা হইল। আমাদের মত হুজুগে লোকের কি আটদিন কাগজ না পড়িয়া বিনা খবরে থাকা সোজা কথা? এক সপ্তাহকাল গভীর নির্জ্জনতার মধ্যে কাটাইয়া সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় আমরা আবার জনকোলাহল-মুখরিত কলিকাতা নগরীতে পৌছিলাম। তাঁহাদের কাছ থেকে বিদায় লইয়া একেবারে সোজা বাড়ী। কেবল দুইটা বাঁশী হাতে লইয়া চটী জুতা চটাস্ চটাস্ করিয়া আমায় একলা ঢুকিতে দেখিয়া সকলেই অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

—

পুরাণ-প্রসঙ্গ।

(শ্রীপ্রেমানন্দ সিংহ এম-এ বি-এল)

(ভূমিকা)

বহুকাল যাবৎ শাস্ত্রাদির বিশেষতঃ পুরাণশাস্ত্রের রীতিমত পঠন-পাঠন ও কথকতাদি বিবিধোপায়ে পূর্ব্বের ন্যায় সুপ্রচার বন্ধপ্রায় রহিয়াছে। নানা কারণে পুরাণ-শাস্ত্রে অবিচলিত বিশ্বাস রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। তাহা ছাড়া, এমন অনেক কথা ও প্রথাদি প্রচলিত আছে, যাহার সহিত শাস্ত্র ও পুরাণের সঙ্গতি রক্ষা করা দুরূহ বলিয়া কথিত হয়। এই জন্য বর্ত্তমান কালে অন্যান্য সমস্যার ন্যায় দেখা দিয়াছে—শাস্ত্র-সমস্যা ও তদন্তর্গত পুরাণ-সমস্যা।

শাস্ত্রাদিতে বিশেষতঃ পুরাণশাস্ত্রে লোকের সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা পুনরানয়ন করিতে হইলে অশ্রদ্ধার কারণনির্ণয় ও

তাহার প্রতীকার অবলম্বন করা প্রয়োজন এবং তৎপরে উপযুক্ত অর্থাৎ কালোপযোগী আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক দেশ, কাল ও পাত্রোপযোগী করতঃ শাস্ত্র বিশেষতঃ পুরাণ-শাস্ত্রের পুনঃপ্রচার আবশ্যক বোধ করি।

ঐ সকল অশ্রদ্ধার কারণ আলোচনা করিতে যাইলে কতকগুলি অপ্রিয় তথ্যের সম্মুখীন হইতে হইবে, কিন্তু ভয় করিলে চলিবে না—নির্ভয়ে প্রিয় ও অপ্রিয় সকল তথ্যের সম্মুখীন হইয়া সত্যের সন্ধান করতঃ তাহা প্রচার করিতে হইবে। সত্যপ্রকাশেই সমস্যার অন্তর্দ্ধান অবশ্যম্ভাবী। সত্য তথ্য প্রকাশে শাস্ত্রের তথা মূল-পুরাণশাস্ত্রের গৌরবই বৃদ্ধি পাইবে ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

আলোচনা দ্বারা পুরাণ সম্বন্ধে সত্যানুসন্ধান ও সত্য-প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমেই—পুরাণরচনায় ব্যাসদেবের সঠিক স্থাননির্দ্দেশ প্রয়োজন। তৎপরে দেখাইব যে, মূল পুরাণশাস্ত্র অবিশ্বাস্য নহে—বরং বর্ত্তমান কালের বিজ্ঞান ও প্রত্নতত্ত্বাদির আবিষ্কারসকল মূল পুরাণ-শাস্ত্রনিহিত ইতিহাস আদির সমর্থনই করে।

পুরাণ হইতে সত্য তথ্য সংকলন ও প্রচার জন্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

পুরাণরচনায় ব্যাসদেবের স্থান।

পুরাণের ইতিহাস।

পুরাণরচনায় ব্যাসদেবের স্থাননির্দ্দেশ করিতে হইলে প্রথমতঃ পুরাণের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করা আবশ্যক। তাহাতে ব্যাসদেবের স্থান কত উচ্চে ও কি ভাবে তাহা নির্ণয় হইতে পারে, ইহা বুঝা সহজ হইবে।

পুরাণাদি-পাঠে আমাদের মনে যে সকল কথা উদিত হইয়াছে, তাহা ক্রমশঃ বর্ণনা করিব। প্রথম কথা আমার এই যে, ব্যাসদেব যেভাবে বেদ সংকলন ও বিভাগ করিয়াছিলেন, সেই ভাবেই তিনি বিশাল পুরাণ-শাস্ত্রকে সংক্ষেপ করতঃ পরিবর্ত্তন বা সংকলন করিয়াছিলেন। ফলতঃ তিনি পুরাণসমূহের সংকলয়িতামাত্র ছিলেন—গ্রন্থকার ছিলেন না, অর্থাৎ তিনি বিশাল পুরাণ-শাস্ত্রকে সংক্ষেপ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন মাত্র; পরন্তু মূল-রচনা তাঁহার নহে—অন্যের। একথা শুনিয়া প্রথমে হয় ত আশ্চর্য্যানুভব হইবে, কিন্তু নিম্নলিখিত কারণগুলি প্রণিধানপূর্ব্বক বিচার করিলে আমার কথার সত্যতা প্রতীত হইবে।

(১) পুরাণের প্রথম যুগ।

মৎস্যপুরাণ হইতে জানা যায় যে—

> নির্দ্দগ্ধেষু চ লোকেষু বাজিরূপেণ বৈ ময়া।
> অঙ্গানি চতুরো বেদান্ পুরাণং ন্যায়বিস্তরম্॥
> মীমাংসাং ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ পরিগৃহ্য ময়া কৃতম্।
> মৎস্যরূপেণ চ পুনঃ কল্পাদাবুদকার্ণবে॥
> অশেষমেতৎ কথিতমুদকান্তর্গতেন চ।
> শ্রুত্বা জগাদ স মুনীন্ প্রতিবেদান্ চতুর্ম্মুখঃ॥

অর্থাৎ "লোকসকল দগ্ধ হইয়া গেলে আমি বাজিরূপ ধারণ করিয়া বেদাঙ্গসকল, বেদচতুষ্টয়, ন্যায়বিস্তর, মীমাংসা ও ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি পরিগ্রহপূর্ব্বক সম্পাদিত করিয়াছিলাম। তৎপরে মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া কল্পারম্ভে পুনরায় আমি একার্ণব জলের অভ্যন্তরে অবস্থান-পূর্ব্বক ঐ সকল অশেষরূপে কীর্ত্তন করিলাম। অনন্তর চতুরানন তৎসমস্ত শ্রবণ করিয়া দেব ও মুনিগণের নিকট প্রকাশ করিলেন।"

মৎস্যপুরাণের এই কথাই স্কন্দপুরাণেও সমর্থিত হইয়াছে; যথা—স্কন্দপুরাণ, আবন্ত্যখণ্ড, রেবাখণ্ড, ২০ শ্লোক হইতে ২৬ শ্লোক পর্য্যন্ত বর্ণনামধ্যে দৃষ্ট হয় যে—"শাস্ত্রনিচয়ের মধ্যে পুরাণই ব্রহ্মার প্রথম শাস্ত্র, তাঁহার বক্ত্র হইতে প্রথমে পুরাণশাস্ত্র নির্গত হইয়া তার পর বেদনিবহ নির্গত হয়। এই কল্পান্তরে ত্রিবর্গ-সাধন ও শতকোটী প্রবিস্তর একই মাত্র পবিত্র পুরাণ ছিল। চতুরানন ব্রহ্মার স্মৃতিমাত্রে এই পুরাণশাস্ত্র তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হয় এবং তিনি মুনিগণের নিকট কীর্ত্তন করেন।"

উপরোক্ত উদ্ধৃত বচনাদি হইতে জানা গেল যে, পুরাণের মূল উৎপত্তিস্থল (origin) বিষ্ণু বা ব্রহ্মা। বিষ্ণু বা ব্রহ্মা দ্বারাই বেদের ন্যায় পুরাণও সর্ব্বপ্রথম রচিত বা প্রকাশিত হয়; পরে ব্রহ্মাই মুনিগণের নিকট ঐ পুরাণসকল প্রকাশ বা কীর্ত্তন করেন। পুরাণাদিতে উক্ত প্রকার এবং আরও অন্যান্য বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, ব্যাসদেবের জন্মের বহু পূর্ব্বে মৎস্যাবতার ও বাজি-অবতারের যুগে পুরাণ বর্ত্তমান ছিল। সুতরাং পুরাণের এই বাক্যসকল সত্য বলিয়া মনে করিলে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ব্যাসদেব কখনই পুরাণের মূল প্রণেতা (original or first author) হইতেই পারেন না।

পুরাণের দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগ।

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বহু যুগ পূর্ব্বে মুনিগণের নিকট পুরাণ-প্রকাশের পর পুরাণ বহুবিস্তৃতি লাভ করে অর্থাৎ পুরাণের শ্লোকসংখ্যা বা আকার দীর্ঘতর ও বহুতর হইয়াছিল। মৎস্যপুরাণ হইতে জানা যায় যে, এমন একটা যুগ আসিয়াছিল যখন পুরাণশাস্ত্র বহুবিস্তৃত হওয়ায় লোকে পুরাণপাঠে বিরত হইয়াছিল; পরে ব্যাসদেব উহার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ সংকলন করায় পুনরায়

লোকসমাজে পুরাণপাঠ প্রচলিত হয়। যথা মৎস্য পুরাণে—

"কালেনাগ্রহণং দৃষ্ট্বা পুরাণস্য ততো নৃপ।
ব্যাসরূপমহং কৃত্বা সংহরামি যুগে যুগে॥" ইত্যাদি।

অর্থাৎ, "কালক্রমে বহুবিস্তৃত অনন্ত পুরাণশাস্ত্র-পাঠে লোকে বিরত হইয়াছিল। তাই ভগবান ব্যাসরূপ ধারণ করিয়া উহা সংক্ষেপতঃ পরিবর্ত্তিত করেন।"

পুনশ্চ —

চতুর্লক্ষপ্রমাণেন দ্বাপরে দ্বাপরে সদা।
তদাষ্টাদশধা কৃত্বা ভূর্লোকেঽস্মিন্ প্রকাশ্যতে।
অদ্যাপি দেবলোকেঽস্মিন্ শতকোটিপ্রবিস্তরম্॥
তদর্থোঽত্র চতুর্লক্ষং সংক্ষেপেণ নিবেশিতম্॥
পুরাণানি দশাষ্টৌ চ সাম্প্রতং তদিহোচ্যতে॥"

অর্থাৎ, "প্রতি দ্বাপরযুগেই এই পরিবর্ত্তন হইয়া আসিতেছে, শত কোটি শ্লোকের সংক্ষেপে চারি লক্ষ শ্লোক দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন নামে অষ্টাদশ পুরাণ কীর্ত্তিত হয়। আর সেই শতকোটি শ্লোকাত্মক পুরাণ এখনও দেবলোকে প্রচলিত।"

মৎস্য পুরাণের এই বর্ণনা স্কন্দ পুরাণেও সমর্থিত হইয়াছে। যথা—স্কন্দ, আবন্ত্যখণ্ডান্তর্গত রেবাখণ্ড, ২৩ হইতে ২৯ শ্লোক পর্য্যন্ত বর্ণনামধ্যে দেখা যায়— "বিভু বিষ্ণু কালক্রমে পুরাণের অগ্রহণ দেখিয়া তপস্বী ব্যাসবেশ ধারণ করিয়া যুগে যুগে পুরাণের উপসংহার করিতে লাগিলেন। ঋষি ব্যাস অষ্টলক্ষ প্রমাণে প্রত্যেক দ্বাপরেই সেই পুরাণ অষ্টাদশধা বিভক্ত করিয়া এই ভূলোকে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। অদ্যাপি দেবলোকে শতকোটিপ্রবিস্তর পুরাণশাস্ত্র বিদ্যমান। ঋষি ব্যাস তাহাকে চতুর্লক্ষাত্মক করিয়া যে অষ্টাদশ পুরাণের প্রণয়ন করেন, তাহাই এক্ষণে সংক্ষেপে বর্ণন করিব।"

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা হইতে এইকয়টী তথ্য জানা গেল যে—(১) ব্যাসদেবের জন্মের বহুপূর্ব্বেই বিষ্ণু ও ব্রহ্মা কর্ত্তৃক পুরাণ প্রকাশিত হয়। (২) ব্রহ্মা মুনিগণের নিকট পুরাণ প্রকাশ করিলেন। (৩) কালক্রমে পুরাণ বহুবিস্তৃত হওয়ায় লোকে পুরাণপাঠে বিরত হয়। (৪) তৎকালে ব্যাসদেব ঐ বিস্তৃত পুরাণকে সংক্ষেপতঃ পরিবর্ত্তিত করেন অর্থাৎ প্রচলিত পুরাণের সংকলন করিয়াছিলেন।

পুরাণের চতুর্থ যুগ ও তদনন্তর যুগ।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে যে, কালক্রমে বহুবিস্তৃত পুরাণশাস্ত্রপাঠে লোক বিরত হইয়াছিল। ধর্ম্মনিষ্ঠ স্বাধীন বিদ্যানুরাগী আর্য্যজাতির মধ্যে কেন এবম্প্রকার ঘটনা অর্থাৎ ইতিহাস বা ধর্ম্মশাস্ত্রপাঠে বিরতি সম্ভব হইয়াছিল, এপ্রশ্ন স্বভাবতঃ ও স্বতঃই মনোমধ্যে উদিত হয়। ইহার কথঞ্চিৎ উত্তর স্কন্দপুরাণে দেখা যায়, যথা—স্কন্দপুরাণ, মহেশ্বরখণ্ডান্তর্গত কুমারিকাখণ্ড ৪০ অধ্যায় ১৯৫ শ্লোক হইতে ২০২ শ্লোক মধ্যে দৃষ্ট হইবে যে—

"সেই ত্রেতাযুগে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত থাকে। ......তার পর দ্বাপরযুগ প্রবৃত্ত হইলে নরগণের বুদ্ধির পার্থক্য ঘটিতে থাকে।......ক্রমশঃ বর্ণসঙ্কর হইতে থাকে ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিধ্বস্ত হইয়া যায়। এই সময়েই ব্যাসগণ ("তদা ব্যাসৈঃ" ইত্যাদি) দ্বিজগণের পক্ষে সুগম করিবার জন্যই এক বেদকে চারি ভাগে বিভাগ করিয়া থাকেন। আর "ইতিহাস-পুরাণানি ভিদ্যন্তে লোকগৌরবাৎ"—অর্থাৎ লোকগণের রুচিভেদানুসারে ইতিহাস পুরাণাদি রচিত হয়।"

সুতরাং পুরাণরচনার কালসম্বন্ধে এই উদ্ধৃত বচন হইতে জানা যায় যে, দ্বাপরযুগে যৎকালে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল, তৎকালেই অর্থাৎ সেই সামাজিক বিপ্লবকালেই জনগণের রুচিভেদানুসারে পুরাণ রচিত বা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।

পুরাণ-সংহিতা।

এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, দ্বাপরযুগে এবম্প্রকার ভীষণ সামাজিক বিপ্লবকালে ব্যাসদেব কোন্ পুরাণ রচনা করিয়াছিলেন ও তাহা এক বা একাধিক—এবং এক হইলে ব্যাসদেব-লিখিত সেই মূল পুরাণ এক্ষণে কোথায়? আরও জানা আবশ্যক, সেই এক পুরাণসংহিতা কাহার বা কাহাদের দ্বারা অষ্টাদশধা বিভক্ত হইয়াছে?

প্রচলিত ধারণা এবং কতকগুলি পুরাণের উক্তি অনুসারে অষ্টাদশ পুরাণই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকর্ত্তৃকই রচিত বলিয়া খ্যাত। ইহার সত্যতা সম্বন্ধে প্রথমে আলোচনা করা যাউক। পুরাণপাঠান্তে আমার ধারণা হইয়াছে যে, ব্যাসদেব অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করেন নাই, তিনি মূলতঃ একখানিমাত্র "পুরাণসংহিতা" লিখিয়াছিলেন।

অনেকগুলি পুরাণের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে মূলতঃ পুরাণ একই ছিল। কয়েকটী পুরাণান্তর্গত পুরাণপ্রস্তাবনা হইতে জানা যায় যে, একটি মাত্র মূল "পুরাণসংহিতা" ব্যাসদেব রচনা করিয়াছিলেন। পরে যেভাবে ব্যাসশিষ্য ও প্রশিষ্যবর্গ কর্ত্তৃক বেদশাখাদি বিস্তার ও প্রচলিত হইয়াছিল, সেই ভাবেই তৎশিষ্য ও প্রশিষ্যগণকর্ত্তৃক উক্ত ব্যাসলিখিত মূল পুরাণসংহিতা বহুধা ও ক্রমশঃ অষ্টাদশধা বিভক্ত হইয়াছিল। যথা:—

(১) মৎস্য পুরাণে—

"পুরাণমেকমেবাসীৎ তদা কল্লান্তরেঽনঘ"

অর্থাৎ তখন কল্লান্তরে মাত্র একখানি পুরাণ ছিল।

(২) স্কন্দপুরাণেও—এই কথা সমর্থিত হইয়াছে—

পুরাণমেকমেবাসীৎ অস্মিন্ কল্লান্তরে মুনে"

অর্থাৎ (সূত সৌনক ঋষিকে বলিতেছেন) হে মুনে! এই কল্লান্তরে একইমাত্র পুরাণ ছিল।

ইহা হইতে জানা গেল যে, মূলতঃ কল্লান্তরে একখানি মাত্র পুরাণ ছিল।

(৩) বিষ্ণুপুরাণ হইতে জানা যায় যে, ব্যাসদেব একটীমাত্র মূল পুরাণসংহিতা রচনা করিয়াছিলেন; যথা, বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয়াংশ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়:—

"আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পসিদ্ধিভিঃ।
পুরাণসংহিতাং চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ॥১৬
প্রখ্যাতো ব্যাসশিষ্যোঽভূৎ সূতো বৈ রোমহর্ষণঃ।
পুরাণসংহিতাং তস্মৈ দদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ॥১৭ ***
কাশ্যপঃ সংহিতাকর্ত্তা সাবর্ণিঃ শাংশপায়নঃ।
রোমহর্ষণিকা চান্যা তিসৃণাং মূলসংহিতাঃ॥১৯
চতুষ্টয়েনাপ্যেতেন সংহিতানামিদং মুনে॥২০

অর্থাৎ পুরাণার্থবিশারদ ভগবান বেদব্যাস—আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কল্পসিদ্ধির সহিত পুরাণসংহিতা (এস্থলে "পুরাণসংহিতাং" শব্দ একবচনে ব্যবহৃত হওয়ায় বুঝিতে হইবে যে একখানি মাত্র) রচনা করিলেন। বেদব্যাসের সূতজাতীয় রোমহর্ষণ নামে বিখ্যাত অপর একজন শিষ্য ছিলেন। মহামুনি ব্যাস তাঁহাকে পুরাণ-সংহিতা (এস্থলেও "পুরাণসংহিতাং" শব্দ একবচনবিধায় একখানিমাত্র "পুরাণসংহিতা" বুঝিতে হইবে) দিয়াছিলেন (বা অধ্যাপন করিয়াছিলেন)। তদনন্তর ১৮ শ্লোকে ব্যাসদেবের প্রশিষ্য বা রোমহর্ষণের ছয় শিষ্যের নামোল্লিখিত আছে; তন্মধ্যে কাশ্যপবংশীয় অকৃতব্রণ, সাবর্ণি ও শাংশপায়ন ইঁহারা রোমহর্ষণ হইতে অধীত মূল সংহিতা অবলম্বনে প্রত্যেকে।একএকখানি পুরাণসংহিতা রচনা করেন। হে মুনে! ঐ চারি সংহিতার সারসংগ্রহ করিয়া আমি এই বিষ্ণুপুরাণ রচনা করিয়াছি।"

(৪) বায়ুপুরাণ:—ব্যাসদেব কর্ত্তৃক একখানিমাত্র পুরাণসংহিতা রচনার সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণোক্ত এই কথাই বায়ুপুরাণেও দেখা যায়। যথা বায়ুপুরাণ ৬০ অধ্যায়—রোমহর্ষণ কহিতেছেন—"রোমহর্ষণ তাঁহার (ব্যাসদেবের) পঞ্চম শিষ্য। ভগবান দ্বৈপায়ন ইতিহাস, পুরাণশাস্ত্র আমাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।" ১৪ ও ১৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য। এস্থলেও 'পুরাণ' শব্দ একবচনে ব্যবহৃত হওয়ায় একখানি মাত্র পুরাণসংহিতা বা ব্যাস কর্ত্তৃক সংকলিত মূল পুরাণই বুঝিতে হইবে।

পুনশ্চ:—পুরাতত্ত্ববিশারদ দ্বৈপায়ন আখ্যা, উপাখ্যান, গাথা ও কুলকর্ম্ম দ্বারা পুরাণসংহিতা (এস্থলেও "পুরাণসংহিতা" শব্দ—একবচনার্থকবিধায় মূল পুরাণ-সংহিতা যে একটিমাত্র ছিল, ইহাতে সন্দেহই হইতে পারে না) রচনা করিয়াছেন। ২১ শ্লোক।

পুনরায়—"ষট্‌শঃ কৃত্বা ময়াপ্যুক্তং পুরাণমৃষিসত্তমাঃ।" বায়ুপুরাণ ৬১ অধ্যায় ৫৫ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, হে ঋষিসত্তমগণ! আমিও ঐ সংহিতা ৬ ভাগে বিভক্ত করিয়াছি।

৫। অগ্নিপুরাণ।

বিষ্ণুপুরাণের এই কথাই পুনরায় অগ্নিপুরাণ কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে। যথা,—অগ্নিপুরাণ, ২৭১ অধ্যায়, ১১ শ্লোক হইতে ১৩ শ্লোক পর্য্যন্ত।

"প্রাপ্য ব্যাসাৎ পুরাণাদি সূতো বৈ লোমহর্ষণঃ।
সুমতিশ্চাগ্নিবর্চ্চাশ্চ মিত্রয়ুঃ শাংশপায়নঃ॥১১॥
কৃতব্রতোঽথ সাবর্ণিঃ ষট্‌শিষ্যাস্তস্য চাভবন্।
শাংশপায়নাদয়শ্চক্রুঃ পুরাণান্ত সংহিতাঃ॥১২॥
ব্রাহ্মাদীনি পুরাণানি হরিবিদ্যা দশাষ্ট চ।
মহাপুরাণে হ্যাগ্নেয়ে বিদ্যারূপো হরিস্থিতঃ॥ ১৩॥

অর্থাৎ "সূত লোমহর্ষণ ব্যাসদেব হইতে পুরাণাদি প্রাপ্ত হইয়া সুমতি, অগ্নিবর্চ্চাঃ, মিত্রয়ু, শাংশপায়ন, কৃতব্রত ও সাবর্ণি এই ছয়শিষ্যকে বিতরণ করেন। শাংশপায়নাদি মুনিগণ পুরাণসমূহের সংহিতা ও হরিবিদ্যাময় ব্রাহ্মাদি অষ্টাদশ পুরাণ প্রণয়ন করিয়াছেন।"

অগ্নিপুরাণের এই শেষোক্ত উদ্ধৃত বচন হইতে ইহা সুস্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, ব্যাসদেবের প্রশিষ্যগণ কর্ত্তৃক (অর্থাৎ ব্যাসশিষ্য লোমহর্ষণ, ঐ লোমহর্ষণের শিষ্যগণ কর্ত্তৃক) অষ্টাদশ পুরাণ রচিত হইয়াছিল।

সুতরাং এক্ষণে উপরোক্ত আলোচনা হইতে জানা যাইতেছে যে—(১) ব্যাসদেব একখানি মাত্র মূল "পুরাণ-সংহিতা" রচনা বা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। (২) পুরাণের অন্তর্গত প্রমাণাদি হইতে বিশেষতঃ অগ্নিপুরাণ হইতে জানা যায় যে, ব্যাসদেবের প্রশিষ্যগণ কর্ত্তৃকই অষ্টাদশ পুরাণ রচিত হইয়াছিল,—ব্যাসদেব কর্ত্তৃক নহে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচার।

(স্বামী সদানন্দ)

একদিন মহর্ষিদেব ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকার্য্য সম্বন্ধে আমাকে বলিয়াছিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলমন্ত্র একেশ্বরবাদ, সসীমের

স্থানে অসীমের উপাসনাস্থাপন, ক্ষুদ্রের পরিবর্ত্তে অনন্তের পূজাপ্রতিষ্ঠিত। এই ভিত্তির উপরে ব্রাহ্মসমাজের আচার-ব্যবহার সামাজিক প্রথাদি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। আমাদের দেবতা বিশ্বপতি পরব্রহ্ম। সকল জাতি এবং সকল সম্প্রদায়েরই তাঁহার পূজা করিবার সমান অধিকার আছে। সুতরাং তাঁহার উপাসনা এবং ধর্ম্ম প্রচার কোন শাস্ত্রবিশেষে বা কোন নির্দ্দিষ্ট ভাষার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। তবে, যে সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার করিতে হইবে, যতদূর সম্ভব তাঁহাদের শাস্ত্রগ্রন্থাদির এবং ভাষার মধ্য দিয়া উপাসনা করিলে বা উপদেশ প্রদান করিলে অধিকতর প্রাণস্পর্শী হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হিন্দু সমাজের মধ্যে যেমন বাইবেল বা কোরাণ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া উপদেশাদি প্রদান করিলে বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে না, তদ্রূপ খৃষ্ট বা মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বেদ-উপনিষদাদি হিন্দুশাস্ত্রের বচন দ্বারা তাহাদের চিত্ত আকর্ষণ করা সম্ভবপর নহে। দেশ-কাল-পাত্রভেদে উপাসনার অঙ্গ এবং ভাষা পরিবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক। তবে নানা ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রতিপাদক সদৃশ বচন উদ্ধৃত করিয়া ধর্ম্মের সার তত্ত্ব বুঝাইয়া দিলে ধর্ম্মবুদ্ধি প্রসারিত হইয়া মনুষ্যের সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্ম্মান্ধতা দূরীকৃত করিতে পারা যায়, ইহা প্রচারক মাত্রেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। আদি-ব্রাহ্মসমাজে যে হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে বচন সংগ্রহ করিয়া উপাসনাপ্রণালী গঠিত হইয়াছে, তাহা যে সকল দেশে বা সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে, তাহা নহে। আদিসমাজের প্রধান কার্য্য হিন্দু-সম্প্রদায়ের মধ্যে। এজন্য উক্ত প্রথা অবলম্বন করাই শ্রেয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। কিন্তু যদি কোন খৃষ্টান বা মুসলমান-দেশে আদিসমাজের শাখা স্থাপিত হয়, তাহা হইলে অবস্থা অনুযায়ী পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইবে, কিন্তু কেবল ঐ সকল দেশের জন্য। বলা বাহুল্য যে মহর্ষিদেব বাইবেল বা কোরাণাদির প্রতি অশ্রদ্ধাবশতঃ এরূপ ব্যবস্থা করেন নাই। তিনি স্বয়ং বাইবেল এবং মুসলমান-ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন; এবং সময়ে সময়ে ঐ সকল ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রতিপাদক বচন আবৃত্তি করিতেন।

মহর্ষিদেবের যুক্তি যে অতি সমীচীন ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমি নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছি যে, সংস্কৃত শ্লোকসমন্বিত আদি-সমাজের উপাসনাপ্রণালী ও ব্যাখ্যানাদি হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে যেরূপ হৃদয়গ্রাহী ও প্রাণস্পর্শী হয়, খৃষ্টীয় উপাসনা-লয়ের অনুকৃত উপাসনাপ্রণালী সেরূপ হয় না। কোন সময়ে ভারতবর্ষের কোন প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মসমাজে আমি মাসে একদিন করিয়া বেদী গ্রহণ করিতাম। আমি দেখিয়াছি, যে যে দিনে উপাসনা করিবার ভার আমার উপর পড়িত, সেই সেই দিবস উক্ত উপাসনামন্দির লোকে পূর্ণ হইয়া যাইত। অপর দিবস তাহার অর্দ্ধেকও পূর্ণ হইত না। কারণ ঐ সকল দিবসে সমাজের সভ্যগণ ব্যতীত অনেক হিন্দু ভদ্রলোক উপাসনায় যোগদান করিতেন।

মহর্ষিদেব আর একটী কথা বলিয়াছিলেন যে, প্রচার-কার্য্যে বৃত হইয়া কোন ধর্ম্মের উপর কটাক্ষপাত বা কোন ধর্ম্মের নিন্দা করিবে না। ইহার দ্বারা কেবল যে বিরোধ টানিয়া আনা হয় তাহা নহে, প্রচারকের আধ্যাত্মিক অবনতিও হইয়া থাকে।

আমরা শুনিয়াছি যে যখন আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বৈদেশিক প্রণালীর অনুকরণে উপাসনা-প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, তখন মহর্ষিদেব ব্যথিত হইয়াছিলেন। শাস্ত্রীমহাশয় শেষজীবনে ইহার জন্য অনুতাপ করিয়া প্রায়ই বলিতেন যে, তিনি সংস্কৃত শ্লোকগুলি উপাসনাপ্রণালী হইতে উঠাইয়া দিয়া বড় ভাল করেন নাই। একথা অনেকেই অবগত আছেন। পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় আজকাল হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া উপদেশ ও প্রবন্ধাদি রচনা করিতেছেন। শ্রীবিপিন চন্দ্র পাল প্রভৃতি ব্রাহ্ম প্রচারকগণও এই পন্থা অনুসরণ করিয়া থাকেন।

এক্ষণে আমাদের দেশে খৃষ্টান ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা ক্রমশঃই কঠিনতর হইতেছে। সুতরাং অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য আমাদিগকে কেবলমাত্র হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচারকার্য্য পরিচালিত করিতে হইবে। এইজন্য আমার বিশ্বাস যে, যতদূর সম্ভব হিন্দুশাস্ত্রের ভিতর দিয়া প্রচার করিতে পারিলে আমরা অধিকতর সফলতা লাভ করিতে পারিব। আমি অবগত হইলাম যে, সম্প্রতি ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারের জন্য একটা সুব্যবস্থা করিবার বন্দোবস্ত হইতেছে। এই নিমিত্ত আমি এই সকল বিষয় উদ্যোগ-কর্ত্তাদের নিকটে উপস্থিত করিলাম। আশা করি তাঁহারা এবিষয়ে একটু চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

প্রাচ্য ভূখণ্ডে নারীর সম্মান।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১। নারীর প্রতি সম্মান ভারতের চিরন্তন রীতি।

প্রাচ্য ভূখণ্ডে স্ত্রীজাতির প্রতি সমাদরপ্রদর্শন একটি বিশুদ্ধ চিরন্তন রীতি। কেবল নামেমাত্র সমাদরপ্রদর্শন

নহে, প্রাচীনকালে ভারতের আর্য্যগণ স্ত্রীলোকদিগকে গৃহের জ্যোতিস্বরূপ এবং পূজার যোগ্য বলিয়া দৃষ্টি করিতেন—"পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ" । তাঁহারা স্ত্রীলোক এবং গৃহের শ্রী উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ দেখিতেন না—"স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন" । আমাদের শৈশবকালে কোন বালক কোন বালিকাকে প্রহার করিলে আমরা স্ত্রী-পুরুষনির্ব্বিশেষে গুরুজনদিগের সকলকেই এই বলিয়া বালককে নিষেধ করিতে শুনিতাম যে, মেয়েমানুষের গায়ে হাত তুলিতে নাই—তাঁহারা মায়ের সমান। হায়! দুঃখের কথা, এভাবের কথা একালে আর অন্ততঃ সহরগুলিতে বড় একটা শুনিতেই পাওয়া যায় না। ইহা হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন, যে চণ্ডী গৃহে গৃহে পঠিত হয়, সেই চণ্ডী বলিতে গেলে, স্ত্রীজাতির মাতৃত্বের উপরই সম্প্রতিষ্ঠিত। চণ্ডী স্ত্রীলোকের মাতৃমূর্ত্তি যেরূপ প্রকটিত করিয়াছেন, অন্য কোন শাস্ত্রে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা" ইহাই বলিতে গেলে চণ্ডীর ভিত্তি বা কেন্দ্র। মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রেরও বোধ হয় মূল উদ্দেশ্য মাতৃত্বের সাধনা। ইহাতে মাতৃত্ব-সাধনার যে প্রণালী উল্লিখিত হইয়াছে, সেই প্রণালী অবলম্বন করিলে অতি অল্পকালের মধ্যেই নারীর মাতৃত্ব-বোধ এবং সুতরাং নারীর প্রতি সম্মানপ্রদর্শন অতি সহজে আয়ত্ত হয়, ইহা অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য।

২। চীনবাসী দার্শনিক কবির অভিমত।

স্ত্রীলোককে ইএ প্রকার মাতৃরূপে দর্শন কেবল ভারতের নহে, কিন্তু সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডেরই অন্তর্নিহিত ভাব বলিয়া মনে হয়। এই সেদিন চীনদেশের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক-কবি লিউ-ইয়েম-হোম এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া স্বীয় মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, স্ত্রী-জাতিকে মাতার আসনে না বসাইলে জগতে কিছুতেই প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হইবে না এবং মঙ্গল সাধিত হইবে না। তাঁহার কথাগুলি অত্যন্ত মূল্যবান, কারণ চীন-দেশের সাধারণতন্ত্রপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যে সংগ্রাম বাধিয়াছিল, সেই সংগ্রামে তিনি বৈপ্লবিকদলের অন্যতর নেতা ছিলেন; এবং সেই দলের প্রচারিত নীতি অনুসারে তিনি পুরুষ ও স্ত্রীলোক সকলকেই নির্ব্বিশেষে সকল বিষয়ে সমান অধিকার দিতে, এমন কি, স্ত্রীলোকদিগকে যুদ্ধের সৈনিকের অধিকার এবং প্রয়োজন মত যুদ্ধনেতারও অধিকার দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই অধিকার-প্রদানের ফল সম্বন্ধে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, সেই অভিজ্ঞতা হইতেই তিনি স্ত্রীজাতিকে সমাজের বহির্বিষয়সমূহে অতিমাত্র ব্যাপৃত থাকার পরিবর্ত্তে মাতৃত্বের আসন পুনরধিকার করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন।

৩। পাশ্চাত্যদিগের মনোভাব।

স্ত্রীজাতিকে মাতৃমূর্ত্তিতে দর্শন পাশ্চাত্য দেশবাসী-গণের হৃদয়ের একটি কোণেরও অংশ স্পর্শ করিয়াছে কিনা সন্দেহ। তাঁহাদের ধর্ম্মপুস্তক বাইবেল স্ত্রীপুরুষের পরস্পর সম্বন্ধের বিষয় যাহা বলিয়াছেন, তাহার মূল-মন্ত্র হইতেছে—ব্যাভিচার করিও না—"Thou shalt oommit no Adaltery"; কিন্তু এই নীতি কিসের বলে কোন্ ভিত্তির উপর—মানবের অন্তর্নিহিত কোন সমুন্নত বৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার কোনই উল্লেখ নাই। সুপ্রসিদ্ধ মার্কিন কবি ওয়াল্টহুইট্‌ম্যান তাঁহার অমর কবিতাপুস্তকে স্ত্রীজাতিকে পুরুষের সহিত সমান আসন প্রদান করিয়া উভয়েরই জয়গীত গাহিয়াছেন, কিন্তু তাহার উর্দ্ধে উঠিয়া স্ত্রীজাতিকে মাতৃত্বের উপযুক্ত গৌরব প্রদান করিতে পারেন নাই। আমাদের বাল্যকালে এই বিষয়ে পাশ্চাত্যদিগের মনোভাবের পরিচায়ক একটী সত্য গল্প শুনিয়াছিলাম। সেই গল্পটী তৎকালে সংবাদপত্রে প্রচারিত হইয়া ভারতবাসী মাত্রেরই উপভোগ্য ও আমোদের বিষয় হইয়াছিল। গল্পটী এই—"এক সাহেবের আপিসে এক বাঙ্গালী কেরাণীগিরি করিত। তাহার পরিবারে পোষ্যবর্গের সংখ্যা অনেকগুলি ছিল। কেরাণী তাহার স্বল্প বেতনে পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিয়া কুলাইয়া উঠিতে পারিত না। সে তাহার মনিবসাহেবকে বেতন বৃদ্ধির জন্য অনেকবার উপরোধ করিয়াও কৃতকার্য্য না হওয়ায় সাহেবের স্ত্রী মেমসাহেবকে বেতনবৃদ্ধির জন্য হাতে পায়ে ধরাই প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া স্থির করিল। সে ভাবিল, মেমসাহেবের সহিত মাতৃত্বের সুবাদ পাতাইলে মেমসাহেব তাহার দুঃখে নিশ্চয়ই বিগলিত হইবেন! ইহা ভাবিয়া একদিন, অবসরমত সাহেব ও মেমসাহেব যখন নির্জ্জনে একত্র চা-পান করিতেছিলেন, সেই সময়ে উপস্থিত হইয়া মেমসাহেবকে সে মাতৃসম্বোধন পূর্ব্বক সকল দুঃখের কথা বলিতে অগ্রসর হইল, কিন্তু দুঃখের কথা আর বলা হইল না। কেরাণী যখনই মেমসাহেবকে মা বলিয়া ডাকিল, তখনই সাহেব উঠিয়া চাবুক আনিয়া তাহার মা বলিবার স্পর্দ্ধার পুরস্কার স্বরূপ তাহার পৃষ্ঠে কয়েক ঘা বসাইয়া তাহাকে বিদায় করিলেন। তার দুঃখ দূর হওয়া তো দূরে থাক, মা বলিবার পুরস্কারস্বরূপে তাহার চাকুরিটী পর্য্যন্ত হারাইতে হইল।

৪। এবিষয়ে দাসমনোভাব পরিত্যাজ্য।

বর্ত্তমানে এদেশে বিশেষত কলিকাতা ও ভারতের অন্যান্য নগরে স্ত্রীজাতিকে মাতার আসনে বসাইয়া

অন্তরে পূজা করিবার ভাব চলিয়া যাইতেছে, তাহা চক্ষুষ্মান ব্যক্তি মাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন নিঃসন্দেহ। ইহার একটি প্রধান কারণ, আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীকে ভারতের সমুন্নত ভাবধারা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া পাশ্চাত্য ভাবের উপর সংগঠিত শিক্ষাপ্রণালীর উপর দাঁড় করাইবার চেষ্টা। আমরা দাসমনোভাবের কারণে নিজেদের বিচারবুদ্ধি হারাইয়া পাশ্চাত্য দেশের দুর্নীতিপ্রবণতার অনুকূল পুরমহিলা ও কুলবধূদিগের সম্ভ্রমশীলতার হানিকর অভিনয় ও নৃত্য প্রভৃতি এদেশে প্রবর্ত্তন করিয়া আনন্দ অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছি। চারিদিকে দুর্নীতির উত্তালতরঙ্গসমূহ সমগ্র ভারতকে যে প্রকার গ্রাস করিবার জন্য মুখব্যাদান করিতেছে, তাহাতে আমাদের মনে হয়, আর তিলমাত্র বিলম্ব না করিয়া পার্থিব সুখের প্রতি অতিরিক্ত বদ্ধদৃষ্টি পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালীর সহিত সম্পূর্ণরূপে একাত্মযোগে যুক্ত না হইয়া অন্তত অনেকাংশে প্রাচ্য সভ্যতার সমুন্নত শিখরে শিক্ষাপ্রণালীকে দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের অধস্তন সন্তানসন্ততিগণকে ঔদ্ধত্য দুর্বিনয় প্রভৃতি জাতীয় অধঃপতনের কারণসমূহ হইতে রক্ষা করিতে চাহিলে সেই নবসংস্কৃত শিক্ষাপ্রণালীতে শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে।

৫। আমাদের কর্ত্তব্য।

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, মহিলানৃত্য প্রভৃতির ভিতর দিয়া সমাজের চারিদিকে নারীত্বের অবমাননার যে বিষবীজ উপ্ত হইতেছে, সঞ্জীবনী, বঙ্গবাসী, তত্ত্ববোধিনী, ভোটরঙ্গ প্রভৃতি সাময়িক পত্রসমূহের প্রবল লেখনী উহার বিরুদ্ধে পরিচালিত হইতেছে। এই সকল সাময়িক পত্র নৃত্যাদির বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেও আমরা মনে করি, তাঁহারা রোগের মূল ধরিয়া সংগ্রাম করিতেছেন না। আমাদের মতে সত্য সত্য এই দুর্নীতিপ্রবণতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে গেলে উহার মূলে গিয়া বর্ত্তমান কালের বারবনিতাশ্রেণীর অভিনেত্রীগণের সহিত যে সকল নাট্যমঞ্চে অভিনয় করা হয়, সেই সকল থিয়েটার প্রভৃতি যাহাতে বাল্যাবধি আমাদের সন্তানগণ বর্জ্জন করে এবং যৌবনের লালসাপ্রদীপ্ত উপন্যাসগুলি সম্পূর্ণ বয়কট করা হয়, তদ্বিষয়ে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করা কর্ত্তব্য; তাহা না করিলে আমাদের বিশ্বাস নারীত্বের অবমাননারূপ বিষবীজসকল কিছুতেই মরিবে না, বরঞ্চ তাহা সময়ে বিষগন্ধ ফল প্রসব করিয়া সমগ্র ভারতকে শ্মশানে পরিণত করিবে। আমাদের মনে হয়, সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া এই বিষয়ে অগ্রসর হইলে আমাদের সফলকাম হইবার সমধিক সম্ভাবনা।

যীশুর গুরু কে?

(শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত)

প্রাচীন ভারত যে ধর্ম্মে কর্ম্মে জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ ছিল এবং আজিকার সভ্য জগৎ যে প্রাচীন ভারতের নিকট কতদূর ঋণী, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব। "যীশুর ভারতীয়ত্ব" কথাটী দেখিয়াই অনেকে বিস্মিত হইবেন। খৃষ্টধর্ম্ম আজ সভ্য জগতে একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। "যীশুর ভারতীয়ত্ব" কথাটী শুনিয়া বিস্মিত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। বিষয়টী লেখকের উদ্ভ্রান্ত মস্তিষ্কের কল্পনা নহে—সংগৃহীত সংবাদ মাত্র, তথ্যান্বেষী পাঠকমহোদয়গণ ইহার সত্যতা বিবেচনা করিবেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে "ইণ্ডিয়ান নেশন" নামক পত্রিকায় "যীশুর গুরু কে" (Who were the Gurus of Jesus Christ) এই নামে একটী ইংরাজী নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। পরে ঐ নিবন্ধটী ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্টের দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়। সর্ব্বশেষে উক্ত প্রবন্ধ "পথের কথা ও নীতিগাথা-সংগ্রহ" নামক পুস্তকে প্রকাশিত হয়। পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

যীশুর গুরু কে?

সকলেই জানেন, যীশুর বাল্যজীবন-কাহিনী নিউ টেষ্টামেণ্ট (New Testament) হইতে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। গস্‌পেল (Gospel) এর শ্লোকসমূহ এবিষয়ে উদাসীন। যীশুর বাল্যজীবনীর এক অংশ এতদিনে প্রকটিত হইল এবং জানা গেল যে, হিন্দু এবং বৌদ্ধগণই ঈশ্বরের পুত্রের ধর্ম্ম-গুরু। কিরূপে এই রহস্য উদ্ঘাটিত হইল?

এম্‌ নাটোভিচ্‌ (M. Natovitch) নামক জনৈক রুশীয় পরিব্রাজক তিব্বত ভ্রমণকালীন তিব্বতের সাধু লামাগণের নিকট সুপরিচিত হন। তাঁহারা কথাপ্রসঙ্গে বলেন যে, তাঁহারা জনৈক পাশ্চাত্য সাধুর কথা জানেন, তাঁহার নাম ছিল ঈশা। অতঃপর তাঁহারা ঐ সাধুর দুইএকটী কথা নাটোভিচের নিকট বলাতে তাঁহার সন্দেহ হয়, উক্ত পাশ্চাত্য সাধু যীশু ব্যতীত অপর কেহই নহেন। লামাগণ বলেন, উক্ত পাশ্চাত্য সাধুর (Prophet) জীবনী হিমিস্‌ নামক একটী মঠে রক্ষিত আছে। কৌতূহলী পরিব্রাজক বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া হিমিস্‌ মঠে উপস্থিত হ'ন। তথাকার বৌদ্ধ ভিক্ষুদের (Monks) নিকট হইতে তিনি দুইটী বিরাট পুঁথি দেখিবার জন্য প্রাপ্ত হন, উহাই ঈশার জীবনী। উক্ত জীবনীর সার মর্ম্ম এই—

ঈশা ইসরাইলপ্রদেশে দরিদ্র পিতামাতার গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব হইতে তাঁহার ধর্ম্মভাব প্রবল ছিল এবং তিনি একেশ্বরবাদ প্রচার করেন। ১৩ বৎসর বয়সে তিনি সিন্ধুপ্রদেশে পলায়ন করেন এবং চৌদ্দ বৎসর বয়সে তিনি আর্য্যদের সহিত জগন্নাথ, রাজগৃহ, কাশী প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন। এই সময় তিনি বেদাধ্যয়ন শিক্ষা করেন ও বেদজ্ঞ হ'ন। তিনি বেদের ঈশ্বরত্ব এবং পরব্রহ্মের অবতারত্ব অস্বীকার করিয়া ব্রাহ্মণদের বিরাগভাজন হইয়া বৌদ্ধদের শরণাপন্ন হ'ন। অতঃপর তিনি পালি শিক্ষা করেন এবং অল্প দিনেই বৌদ্ধধর্ম্মের রহস্যজ্ঞ হ'ন। পরে তিনি পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে প্রচার করিতে করিতে পারস্য দেশে উপনীত হ'ন। তথা হইতে পলায়ন করিয়া ২৯ বৎসর বয়সে তিনি জুডিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার জনপ্রিয়তা দেখিয়া পন্টিয়াস্ পীলাত (Pontius Pilate) ভীত হন এবং তাঁহাকে ধৃত করিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করেন। তথাকার জ্ঞানী ব্যক্তিগণ তাঁহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া মুক্তি দেন। ঈশা পুনরায় ধর্ম্মপ্রচার করেন। ধর্ম্মের প্রসার দেখিয়া পীলাত পুনরায় তাঁহাকে ধৃত করেন এবং দুইজন ডাকাতের সহিত তাঁহার বিচার হয়। মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার জন্য কয়েক জন লোকও উপস্থিত ছিল। বিচারকালীন ঈশার জ্ঞানগর্ভ উত্তরে পীলাত খুব ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁহাকে ক্রুশবিদ্ধ করিতে হুকুম দেন। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ইহা পাপ কাজ ভাবিয়া পবিত্র জলে হস্ত ধৌত করেন। যীশুকে ডাকাতদের সহিত ক্রুশবিদ্ধ করা হয়। তৃতীয় দিনে যীশুর শবাধার শূন্য দেখা যায়। উপরিউক্ত কাহিনী নিউ টেষ্টামেণ্টে বর্ণিত যীশু-চরিতের প্রায় অনুরূপ। অতএব বুঝা গেল, যীশু প্রথমে হিন্দুগণের এবং পরে বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে (ধর্ম্ম) শিক্ষা করেন ··· ···।

যদি এই সকল ঘটনা সত্য হয়, তবে যীশুকে লইয়া গৌরব করিবার কারণ ভারতের আছে। কারণ হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারতীয় ধর্ম্ম। শেষোক্ত ধর্ম্মটী আবার হিন্দুধর্ম্ম হইতেই উদ্ভূত। এ বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা বাঞ্ছনীয়।

—সময়, ১২।৫।৩৮

রাজা রামমোহন রায়।

(শ্রীরত্নাবলী বড়ুয়া বি-এ)

ভারতের ইতিহাস তিনটী যুগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—প্রথমতঃ Creative বা উৎপত্তি যুগ; যে সময় ঋষিগণ মিলিত হইয়া ভারতবর্ষকে সর্ব্বপ্রকারে এক উন্নত সোপানে রাখিয়াছিলেন। তাহার পর অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন যুগ (Dark age), যে সময় ভারতের সকল দিকে অধোগতির সূচনা—মানসিক বল, আধ্যাত্মিক বল, নৈতিক বল, সামাজিক বল, সকল বিষয়ে একটা নিশ্চলতার লক্ষণ দেখা দিয়াছিল—ভারতবাসীগণের মধ্যে নানাপ্রকার কুসংস্কার প্রবেশ করিয়াছিল। তৎপরে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষণে আসিয়া ভারতে একটী নূতন যুগের সৃষ্টি হয়, যে সময় ভারতবাসীর মনে সামাজিক উন্নতি (social regeneration) এবং জাতীয়তার ভাব পরিলক্ষিত হয়। এই যুগকেই রামমোহন-যুগ বা নবভারত-যুগ বলিতে পারি।

যে সময়ে রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম হয়, সেই সময়ে ভারতের সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবন অতি হীন অবস্থায় ছিল। নানাবিধ কুসংস্কার প্রবেশ করিয়া পবিত্র হিন্দুধর্ম্মকে কলঙ্কিত করিতেছিল, বহু সঙ্কীর্ণ রীতি-নীতি হিন্দুর সামাজিক জীবন অপবিত্র করিয়া তুলিয়াছিল। ভারতবর্ষের এই ক্রমশঃ অবনতি-পথে রাজা রামমোহন রায়ই বাধা দিয়াছিলেন। এই অন্ধকারাচ্ছন্ন ভারতের ভাগ্যাকাশে নব-ভারতের প্রথম আলোকরেখা আমরা রামমোহন রায়ের জীবন-কালে দেখিতে পাই। নানাদিক্ হইতে অশেষ বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও, অক্লান্তভাবে জাতীয় জীবনের উদ্ধারের জন্য এক মহাব্রতে ব্রতী হন প্রথম রামমোহন রায়।

রামমোহন রায়ের জীবনীর বিষয়ে আজকাল সকলেই জানেন। সেই বিষয়ে অধিক আলোচনা করিয়া আমার প্রবন্ধটীর আকার বৃদ্ধি করিতে চাহি না। রামমোহন রায়ের মহত্বের বিষয়ে কয়েকটী মাত্র কথা বলিয়া এই প্রবন্ধটী শেষ করিব। রাজা রামমোহন রায়ের যদিও আপন জন্মস্থানের প্রতি অধিক প্রীতি ছিল, তথাপি তিনি সমস্ত ভারতের হিতৈষী ও হিতসাধক ছিলেন। তিনি স্বজাতি হিন্দুসম্প্রদায় ও তাহার শাস্ত্রকে শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই হিন্দুধর্ম্মের মূল ও প্রধান সত্যসকলের উপর তাঁহার অত্যন্ত আস্থা ছিল; কিন্তু তিনি ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণচেতা ছিলেন না। মুসলমান, খৃষ্টানাদি অন্যান্য সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম ও শাস্ত্রসকল যথেষ্ট অধ্যয়ন করিয়া তাহার মূল তত্ত্বসকল বুঝিয়া, সেই সকল ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার সম্পূর্ণ প্রীতি ও শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। এই শাস্ত্রসকল কেবল যে তিনি পণ্ডিতের ন্যায় পাঠ করিয়াছিলেন তাহা নহে, নিজেই মহামনস্বী ছিলেন বলিয়া মনন ও ধ্যানের দ্বারা সকল ধর্ম্মের সার-সত্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন;

কিন্তু শ্রদ্ধা-ভক্তি তাঁহার বিচারশক্তিকে বলহীন করিতে পারে নাই।

যাহাতে ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও অধিকার স্বাধীন দেশের সমকক্ষ হয়, এইটাই তাঁহার অন্তরের ইচ্ছা ছিল। ভারতবর্ষ যে কালে স্বরাজলাভ করিবেই, ইহা তিনি তখনই বুঝিতে পারিয়াছিলেন—যদিও স্বরাজ কথাটী তিনি ব্যবহার করেন নাই। ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় উন্নতির জন্য তিনি তৎকালোচিত অশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রীয় উন্নতির চেষ্টায় তাঁহাকে আধুনিক যুগের প্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে। মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় ভারতবর্ষের মুক্তির সাধনে তিনি নিরস্ত্র-চেষ্টার প্রবর্ত্তক ছিলেন এবং শাসনকর্ত্তাদিগের সাহায্যে তিনি এই সকল করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন।

ভারতবাসী বিদ্যালাভ প্রভৃতি বিষয়ে সুযোগ পাইলে য়ুরোপবাসীর যে সমকক্ষ হইতে পারিবে, এই মত তিনি তাঁহার গ্রন্থাবলীতে প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতীয় জ্ঞানসমষ্টি যে পাশ্চাত্য জ্ঞানসমষ্টি অপেক্ষা কোনগুণে হীন নহে, এই কথাই তিনি বিশ্বাস করিতেন। রাজা রামমোহন রায়ের এমন স্বাজাত্য ও স্বাদেশিকতা থাকা সত্ত্বেও তাঁহার হৃদয়ে একটা অতি উদার বিশ্বজনীন মানবপ্রেম ছিল। বিদেশী কোন জাতি স্বাধীনতা লাভ করিলে তাঁহার অত্যন্ত আনন্দ হইত, এবং স্বাধীনতা-লাভের চেষ্টায় কোন জাতি বিফলপ্রযত্ন হইলে তিনি মনে অত্যন্ত দুঃখ পাইতেন। আয়র্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা-যুদ্ধের সময় তিনি সেই জাতির প্রতি সমবেদনা জানাইয়াছিলেন এবং তাহাদিগের প্রতি ইংলণ্ডের অত্যাচারের বিষয়ে তিনি তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। জাতিদেশনির্ব্বিশেষে তাঁহার স্বাধীনতা-প্রিয়তা কত প্রবল ছিল, ইহা হইতেই বুঝা যায়।

সামাজিক বিষয়ে, ধর্ম্মবিষয়ে ও আধ্যাত্মিক বিষয়েও তিনি সকলের মঙ্গল ও স্বাধীনতাপ্রার্থী ছিলেন। এই সকল সাধনা তিনি তাঁহার জীবনের মুখ্যব্রত করিয়াছিলেন, এবং এই সকল সাধনার পথে নানারূপ বাধা-বিঘ্ন থাকা সত্ত্বেও তাঁহার সঙ্কল্পের স্থিরতা সামান্যমাত্রও ভ্রষ্ট হয় নাই। বঙ্গদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তনের মূলে রাজা রামমোহন রায়ই ছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞানাদির জ্ঞানলাভ আবশ্যক, এবং সেই সময়ে ইংরাজী না জানা থাকিলে এই প্রকার জ্ঞানলাভের অন্য উপায় নাই দেখিয়া তিনি ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করেন এবং তাহার ফলে বর্ত্তমান শিক্ষালাভের মূলভিত্তি স্থাপন করিয়া যাইতে পারিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া মনে করা উচিত নহে যে, তিনি কেবল বিদেশী শিক্ষাপ্রচারেই যত্নপরায়ণ ছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভারতের অতুলনীয় পরাবিদ্যা যাহাতে লুপ্ত না হয়, বিস্মৃতির অতলজলে নিমগ্ন না হয়, তাহার জন্য নিজে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যেই তিনি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন।

রাজা রামমোহন রায় একজন বিশ্বপ্রেমিক ছিলেন দেখিয়াই অধুনা সমস্ত সমাজেই তাঁহার এমন সমাদর। তিনি পৃথক পৃথক ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলি মধ্যে সকলের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধার দ্বারাই একটা মিলনের সত্যপথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনি দেশে দেশে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে একটী মিলনস্থান স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, এবং যাহাতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে আদানপ্রদান ধনীদরিদ্রের আদানপ্রদানের ন্যায় না হয়—সমান-সমানের ন্যায় হয়, তাহার নিমিত্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মনোরাজ্যের মধ্যে একটা সেতু রচনা করিয়া গিয়াছেন।

মহাপুরুষ রাজা রামমোহন রায়ের নিকট বিশেষ করিয়া নারীসমাজ অধিক সমাদরের বিষয়। তিনি যে কেবল পুরুষের হীনদশা দেখিয়া তাহার মুক্তির চেষ্টা করিয়াছিলেন এমন নহে, ভারতসমাজে নারীর দুর্গতি দেখিয়াও তিনি বড় দুঃখ পাইয়াছিলেন। নারীর দায়াধিকার ও নারীর সামাজিক স্বাধীনতা সম্বন্ধে তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান ভারতের শিক্ষিতা নারীসমাজের অপেক্ষা অন্য কেহ বোধ হয় অধিক উপলব্ধি করিতে পারিবে না। এই বিষয়ে তাঁহার সমতুল্য ভারতে অদ্যাপি কোন সমাজসেবক জন্মায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

দণ্ডবিবেক।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বি-এল)

দণ্ডবিবেক-গ্রন্থ পাঠে জানিতে পারা যায় যে, হিন্দু-রাজত্ব আমলে পাত্রবিশেষে রাজদণ্ডের বা শাস্তির তারতম্য ঘটিত। বিচারককে লক্ষ্য রাখিতে হইবে দণ্ড দিবার সময় নিম্ন কয়েকটি বিষয়ে—

জাতির্দ্রব্যং পরিমাণং বিনিয়োগঃ পরিগ্রহঃ।
বয়ঃ শক্তির্গুণো দেশঃ কালো দোষশ্চ হেতবঃ॥

১। অপরাধীর জাতি, ২। দ্রব্য—যাহা লইয়া অপরাধ, চোরের পক্ষে হৃত সম্পত্তি, ৩। পরিমাণ—

দ্রব্যের পরিমাণ, ৪। বিনিয়োগ—হৃত দ্রব্যের ব্যবহারিক উপকারিতা ৫। পরিগ্রহ—যাহার দ্রব্য গৃহীত, ৬। বয়ঃ—অপরাধীর বয়স ৭। শক্তি—অর্থাৎ অপরাধীর অর্থশক্তি, ৮। গুণ—ন্যূনাধিক দণ্ডের প্রয়োজন, ৯। দেশ—কোন্ দেশের অধিবাসী—গ্রামের বা অরণ্যের, ১০। কাল—দিবস বা রাত্রি, ১১। দোষ—অপরাধবিশেষে। ইংরাজি আইনে স্পষ্টতঃ এরূপ বিধান না থাকিলেও বিচারকগণ এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উচিত দণ্ড বিধান করিয়া থাকেন। 'দোষ' বা অপরাধবিশেষ আবার দুই ভাগে বিভক্ত—অনুবন্ধ ও অননুবন্ধ অর্থাৎ জীবনে একবার মাত্র কৃত (solitary) বা অনেকবার (repeated) কৃত। একবারমাত্র করিলে শাস্তির পরিমাণ অল্প। বহুবার অনুষ্ঠিত হইলে শাস্তির পরিমাণ প্রতিবারেই অধিক।

পাত্রবিশেষে দণ্ডের ন্যূনাধিক্য আছে।

"অষ্টাপাদ্যন্তু শূদ্রস্য, স্তেয়ে ভবতি কিল্বিষং, ষোড়শৈব তু বৈশ্যস্য, দ্বাত্রিংশৎ ক্ষাত্রিয়স্য তু। ব্রাহ্মণস্য চতুঃষষ্টিঃ পূর্ণং বাপি শতং ভবেৎ।" চৌর্য্য অপরাধে শূদ্রের চোরাই মালের মূল্যের ৮ গুণ, বৈশ্যের ১৬ গুণ, ক্ষত্রিয়ের বত্রিশ গুণ, ব্রাহ্মণের ৬৪ গুণ বা একশত গুণ অর্থদণ্ড হইবে। কেননা, হীন জাতির অজ্ঞান বশতঃ পাপ করা স্বাভাবিক। উচ্চতর জাতির সম্বন্ধে সেরূপ নহে। কাত্যায়নও ঐ শ্লোকের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—

যেন দোষেণ শূদ্রস্য দণ্ডো ভবতি ধর্ম্মতঃ।
তেন বিট্-(বৈশ্য) ক্ষত্র-বিপ্রাণাং দ্বিগুণো দ্বিগুণো ভবেৎ॥

অল্প মূল্য দ্রব্যের চৌর্য্যে নারদের মতে চোরের হৃত দ্রব্যের পাঁচগুণ অর্থদণ্ড হইবে। একশত সংখ্যক রত্নের চৌর্য্যাপরাধে বধদণ্ড হইবে।

এতৎব্যতীত পাঁচটি বিষয়ের দিকে বিচারকের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। (১) বাধ, (২) অপকর্ষ, (৩) সাম্য, (৪) উৎকর্ষ, (৫) পরিনিষ্ঠা। বাধ অর্থে দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি। ঐ বাধ আবার দুই ভাগে বিভক্ত—(ক) সাধারণ, (খ) অসাধারণ। সাধারণ বাধ অনুসারে গুরু, পুরোহিত, ব্রহ্মচারী ও রাজা এই কয়েকজন বধ-দণ্ডনীয় হইবে না। রাজা অর্থে অবান্তর নরপতিও বধ দণ্ডনীয় নহেন। অসাধারণ বাধ অর্থে নিজ জীবন বা আত্মরক্ষার জন্য (self-defence) অকার্য্যকরণেও দণ্ড হইবে না। কেননা "আত্মানং গোপায়ীত" আপনাকে সতত রক্ষা করিবে, ইহা শাস্ত্রবাক্য। ঐরূপ অপরাধে রাজদণ্ডের আবশ্যক নাই, প্রায়শ্চিত্তই পাপমোচনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত। ক্ষুধার্ত্ত, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও পথিক পথিপার্শ্বস্থ ক্ষেত্র হইতে ইক্ষু বা মূলা বা সামান্য কিছু অপহরণ করিলে তাহারও দণ্ড হইবে না।

অপকর্ষ। চুরি করিতে হইলে পর পর অনেকগুলি কার্য্য করিতে হয়। সিঁদ কাটা, হৃতদ্রব্য চুরি করিয়া লইয়া পলায়ন ইত্যাদি। একারণে চুরিকে "অনেক কর্ম্মকলাপসাধ্য" বলা হইয়াছে। চুরির আরম্ভে (attempt) ধরা পড়িলে প্রকৃত চুরি অপরাধের একচতুর্থ দণ্ড হইবে। চুরিকার্য্যে আর একটু অগ্রসর হইলে অর্দ্ধেক দণ্ড হইবে। চুরির কার্য্য সমাপ্ত হইলে চোরের পূর্ণ দণ্ড। ঐ পূর্ণ দণ্ডকেই 'সাম্য' বলে।

উৎকর্ষ। প্রথম অপরাধের জন্য দণ্ডের পরিমাণ অল্প। কিন্তু প্রথম দণ্ড ভোগ করিয়াও যাহার চৈতন্য হয় নাই—আবার অপরাধ করে, তাহার পক্ষে দণ্ডের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে।

পরিনিষ্ঠা। প্রাণীহত্যা ব্যতীত অপরাধে পিতা রাজা প্রভৃতির কেবল বাক্‌দণ্ড হইবে, এবং সন্ন্যাসীদিগের ধিক্‌দণ্ড হইবে। যথা "গুরূন্ পুরোহিতান্ পূজ্যান্ বাক্‌দণ্ডেনৈব দণ্ডয়েৎ"। অস্পৃশ্য, ধূর্ত্ত, ক্রীতদাস, ম্লেচ্ছ এবং অসবর্ণ-বিবাহজাত অপরাধীদিগের অর্থদণ্ড ব্যতীত অন্যরূপ দণ্ড হইবে। কেননা অন্যায়-উপার্জ্জিত বলিয়া ইহাদের অর্থ মলাত্মক অর্থাৎ মলিন। দাস পরতন্ত্র অর্থাৎ মনিবের একান্ত অধীন বলিয়া তাহাদের ধনদণ্ড হইবে না। পূর্ব্বপ্রস্তাবে সামান্যভাবে বলিয়াছি যে শিল্পীর শিল্পোপকরণ, বণিকদিগের তুলাদণ্ড এবং মান ও প্রতিমান অর্থাৎ বাটকারা, কৃষকদিগের গরুর গাড়ি ও বীজধান্য পেশাদার নাট্যজীবিদিগের বাদ্যভাণ্ড অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি, বেশ্যাগণের গৃহশয্যা অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি এবং যোদ্ধাগণের অস্ত্র-শস্ত্রাদি, রাজা অর্থদণ্ডের বিনিময়ে ক্রোক বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না। কেননা ঐ সমস্ত উপকরণই তাহাদের জীবিকার উপায়-মাত্র, একেবারে নিঃস্ব হইলে তাহারা আরও পাপকর্ম্ম করিবে।

কাহাকেও রাগাইয়া দিলে যদি সে বিষভক্ষণ করে, তাহা হইলে যে ক্রোধ উৎপাদন করিয়া দিয়াছে, সে বধদণ্ডনীয় হইবে না। সাধারণ নিয়ম হইতেছে এই যে, সামান্য অপরাধে বাক্‌দণ্ড, অপরাধ-চেষ্টায় ধিক্‌দণ্ড, পূর্ণ অপরাধে অর্থদণ্ড এবং রাজদ্রোহে বন্ধনদণ্ড বা নির্ব্বাসন-দণ্ড। মহা অপরাধকারীর পক্ষে সকল প্রকার দণ্ডই এককালে প্রযোজ্য। বাক্‌দণ্ড ও ধিক্‌দণ্ড ব্রাহ্মণ-বিচারক দিতে পারিবেন; কিন্তু অর্থদণ্ড ও বধদণ্ড বা কায়দণ্ড

কেবলমাত্র রাজাই দিতে পারিবেন, ইহা বৃহস্পতি-সম্মত।

মনুষ্যমারণ-দণ্ড।

"অবিজ্ঞাতে হন্তরি" অর্থাৎ কে হত্যা করিয়াছে তাহা না জানা থাকিলে সুবিচার জন্য যাজ্ঞবল্ক্যের মতে রাজ-পুরুষদিগকে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

(ক) মৃতের পুত্র, বন্ধুবর্গ ও রক্ষিতা স্ত্রী প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, কাহার সঙ্গে তাহার শত্রুতা ছিল।

(খ) কোন্ উদ্দেশ্য লইয়া মৃত, মৃত্যুর পূর্ব্বে কাহার সহিত বাটীর বাহির হইয়াছিল অর্থাৎ নারীসংগ্রহ, দ্রব্য-সংগ্রহ অথবা জীবিকাসংগ্রহের জন্য।

(গ) যে স্থানে হত্যা হইয়াছে, সেইখানকার স্থানীয় লোকগণকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।

এইরূপ নানা তথ্য লইয়া বৈর অনুমানে ঘাতক কে, তাহা স্থির করিতে হইবে।

তাহার পরে ঘাতক স্থির হইলে দণ্ডের ব্যবস্থা এই-রূপ। ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ বধ হইলে তাহাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ, অধিকন্তু বধদণ্ড প্রয়োজ্য। ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র ঐ-ঐ জাতি কর্ত্তৃক নিহত হইলে ক্ষত্রিয়ের অপরাধীর পক্ষে সহস্র ধেনুদণ্ড, বৈশ্যের পক্ষে শত ধেনুদণ্ড, শূদ্রের পক্ষে দশ ধেনুদণ্ড। বৈশ্য বা শূদ্র বধ হইলে অধিকন্তু একএকটী বৃষ অপরাধীর নিকট হইতে দণ্ডস্বরূপে আদায় হইবে। ঋতুমতী স্ত্রীলোককে বধ করিলে ক্ষত্রিয়বধের জন্য যে দণ্ড, তাহাই প্রয়োজ্য হইবে। ব্রাহ্মণ যদি অন্য তিন জাতির মধ্যে কাহাকেও হত্যা করে, তাহা হইলে অপর তিন জাতি কর্ত্তৃক হত্যা হইলে যে সাজা হয়, ব্রাহ্মণেরও সেই সাজা বা দণ্ড হইবে, ইহা বৌধায়নসম্মত। যদি কতকগুলি লোক একত্র মিলিয়া ক্রোধপরবশ হইয়া কাহাকেও হত্যা করে, তাহা হইলে যাহার প্রহারে মৃত্যু ঘটিয়াছে, সেই ব্যক্তি বধদণ্ড-যোগ্য, তাহার সঙ্গীগণ সহায় বিধায় তাহাদের প্রত্যেকের দণ্ডের পরিমাণ অর্দ্ধেক, একথা আমরা পূর্ব্বেই বিবৃত করিয়াছি। যদি কেহ অপরকে অর্থসাহায্যে বশীভূত করিয়া তাহার দ্বারা সাহস বা অপরাধের কার্য্য করায় (কারয়েৎ), তাহা হইলে অপরাধী যে দণ্ডে দণ্ডিত হইবে, ষড়যন্ত্রকারীর দণ্ড তাহার চতুর্গুণ হইবে।

ব্রাহ্মণেতর-জাতিহত্যা সম্বন্ধে বৌধায়নসম্মত দণ্ড যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা গ্রন্থকার বর্দ্ধমানের অভিমত নহে। বর্দ্ধমান স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন "স্বজাতীয়-বধে বধ এব হন্তুঃ" অর্থাৎ স্বজাতিবধে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ-বধে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়-বধে, বৈশ্য বৈশ্যবধে, শূদ্র শূদ্রবধে বধদণ্ডে দণ্ডিত হইবে এবং উক্ত মতের পোষকতায় বর্দ্ধমান আপস্তম্ব মুনির এক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, "ঘাতনে তু প্রমাপণং" হত্যা করিলেই তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।

উপরে যাহা বিবৃত হইল তাহা কামকৃত অপরাধ অর্থাৎ (intentional) ইচ্ছাকৃত। যেখানে অপরাধ কামকৃত নহে, কিন্তু প্রমাদকৃত বা অকামকৃত (unintentional) তাহা "দণ্ডপারুষ্য"পরিচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে। তাহার সারাংশ পরে বিবৃত করিব।

ইতিপূর্ব্বে অকারণ প্রাণীবধেও যে বধকারী দণ্ডার্হ হইত, তাহার উল্লেখ করিয়াছি। বৌধায়নের ধর্ম্মসূত্রে এইরূপ উল্লেখ আছে—"হংস, বায়স, বর্হিণ, চক্রবাক, বলাকা, কাক, উলুক (পেচক), মণ্ডুক, নকুল, অহি, খঞ্জরীট, বভ্রু-নকুলাদীনাং বধে শূদ্রবৎ"। নকুল অর্থে জলনকুল (সম্ভবতঃ ভোঁদড়), বভ্রু-নকুল অর্থে স্থলনকুল অর্থাৎ বেঁজি। ইহাদিগকে অকারণ বধ করিলে শূদ্রহত্যা করিলে যে দণ্ড হয় (এখানে বধদণ্ড নহে), তাহাই প্রযোজ্য। ইহার মধ্যে কয়েকটি প্রাণী সম্মার্জ্জক-শ্রেণীভুক্ত বিধায় তাহাদের বধ শাস্ত্রবিরোধী ছিল।

গ্রন্থপরিচয়।

ক্ষণজন্মা ক্ষণাদেবী—শ্রীমতী চারুবালা সরস্বতী প্রণীত। মূল্য ৶০ আনা। প্রাপ্তিস্থান ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং কোং, ২২নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

নারীর বিষয় লিখিবার ভার লইয়াছেন নারী। খুবই সঙ্গত হইয়াছে। গ্রন্থখানি ৮০ পৃষ্ঠাব্যাপী; তন্মধ্যে অধিক পৃষ্ঠায় ক্ষণার জীবনী লিখিত বাকী অংশে ক্ষণার বচন। আমরা বহু পূর্ব্বে "নবনারী"-গ্রন্থে ক্ষণার সংক্ষিপ্ত জীবনী পড়িয়াছিলাম। কিন্তু তাহার পরে এবিষয়ে আর কোন সাড়াশব্দই পাই নাই। এই গ্রন্থে উহা নবতরভাবে লিখিত দেখিতেছি। গ্রন্থখানির লিখনভঙ্গী খুবই ভাল। ইহার ভিতর একটি পবিত্র ভাবের হাওয়া বহমান। গ্রন্থখানি প্রত্যেক বালক-বালিকার হস্তে দিবার উপযুক্ত। পরিশিষ্টে "ক্ষণার বচন"গুলি দেওয়ায় গ্রন্থখানি বিশেষ মূল্যবান হইয়াছে,

মনে হয়। এই বচনগুলির অতিরিক্ত আরও অনেক বচন খনার নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

উপনিষৎরহস্য বা গীতার যৌগিক ব্যাখ্যা—শ্রীমৎবিজয়কৃষ্ণ দেবশর্ম্মা প্রণীত; মূল্য ৸০ আনা। প্রাপ্তিস্থান:—উপনিষৎরহস্য-কার্য্যালয়—কোঁড়ার বাগান, হাওড়া।

গ্রন্থের নাম "উপনিষৎরহস্য বা গীতার যৌগিক ব্যাখ্যা"। আমাদের মনে হয়, শেষোক্ত নামই অর্থাৎ 'গীতার যৌগিক ব্যাখ্যা' গ্রন্থের উপযুক্ত নাম। আমরা গ্রন্থের আদ্যোপান্ত পড়িয়া দেখিলাম। আমরা যে ভাবে উপনিষদ পড়ি ও জানি, সে ভাবে উপনিষদের রহস্য বিষয়ে কোন তত্ত্ব গ্রন্থে প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া দেখি না। গ্রন্থে গীতার বিষাদযোগ নামক প্রথম অধ্যায়ই সবিস্তর ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই ব্যাখ্যাগুলি ভক্তের প্রাণের ভিতর দিয়া বাহির হইয়াছে, সুতরাং সে সম্বন্ধে আমাদের বেশী কিছু বলিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। সংস্কৃত শব্দগুলি ব্যুৎপত্তির ভিতর দিয়া দেখিতে চাহিলে অনেক অর্থই প্রকাশ করিতে পারে। এই দিক দিয়া অনেক পণ্ডিত গীতারও অনেক প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা গীতার এবং মহাভারতীয় যুদ্ধ প্রভৃতির ঐতিহাসিকত্ব স্বীকার করি; কাজেই গীতায় ব্যবহৃত শব্দগুলির অতিরিক্ত কষ্টসাধ্য অর্থ ধরিবার পক্ষপাতী নহি। শ্রীমৎবিজয়কৃষ্ণ দুর্য্যোধন অর্থে দুর্দ্দমনীয় মন এবং পঞ্চপাণ্ডব অর্থে পঞ্চকোষ এবং আরও অনেক শব্দের অনেক প্রকার কষ্টসাধ্য অর্থ ধরিয়া ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন। ব্যাখ্যাগুলি এই সকল কষ্টসাধ্য অর্থের উপর দাঁড় করাইলেও আমাদের বেশ মিষ্ট লাগিয়াছে। ইনি 'কুরুক্ষেত্র'-শব্দের উৎপত্তি কৃ-ধাতুর অনুজ্ঞাসূচক "কর"-অর্থবাচক "কুরু" শব্দ হইতে বলিয়াছেন—ইহা নূতন বটে; কুরুক্ষেত্র-শব্দের এই ব্যাখ্যা ইতিপূর্ব্বে আমাদের শ্রুতিগোচর হয় নাই। শ্রীমৎবিজয়কৃষ্ণের এই সকল ব্যাখ্যা যখন "বঙ্গবাসী"তে প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন আমরা সেগুলি পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলাম। এখন শ্রীযুক্ত কুমদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় সেগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিয়া ভক্তদিগের মহৎ উপকার সাধন করিয়াছেন।

খৃষ্টানুসরণ—খৃষ্টতত্ত্বপ্রচারসমিতি কর্ত্তৃক ২নং ওয়েলিংটন লেন হইতে প্রকাশিত ও শ্রীযুক্ত সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনুবাদিত। মূল্য ১৷৷০ টাকা মাত্র।

আমরা গ্রন্থখানি দেখিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। ইহার আকার পরিপাটি। ইহা "ইমিটেশন অফ্ ক্রাইষ্ট" নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের অনুবাদ। ইতিপূর্ব্বে ঐ গ্রন্থের ভাব লইয়া অনেক ছোট-বড় গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে দেখিয়াছি; কিন্তু সম্পূর্ণ গ্রন্থের অনুবাদ এই প্রথম আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও উপাসনার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় যখন ইহার অনুবাদক, তখন অনুবাদের ভাষা যে সুন্দর হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। আমরা ইহার অনেকাংশ পড়িয়া দেখিলাম। বাস্তবিকই অনুবাদটী সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য হইয়াছে। এই গ্রন্থের প্রকাশে বঙ্গসাহিত্য সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইল, তাহা বলিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করি না। ইহার ভূমিকা যদি সত্যই শ্রীযুক্ত শোর-মহোদয় কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইয়া থাকে, তবে তাঁহার বঙ্গভাষায় জ্ঞান দেখিয়া আমরা বড়ই সুখী হইলাম। কেবল একটি স্থানে তিনি 'ননখৃষ্টিয়ান্' শব্দের অনুবাদ 'ন-খৃষ্টান' করিয়াছেন, আমাদের মতে উহা 'অ-খৃষ্টান' করিলেই ভাল হইত। এই প্রসঙ্গে আমরা সাবিত্রীপ্রসন্ন বাবুকে একটি অনুরোধ করিতেছি যে, তিনি যদি রাজা রামমোহন রায়ের "Precepts of Jesus"—Guide to peace and Happyness" গ্রন্থের বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন, তবে উহা কেবল খৃষ্টির সম্প্রদায়ের নহে, কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের ভক্তিপিপাসুমাত্রেরই উপকার সাধন করিবে।

পল্লীস্বাস্থ্য ও সরল স্বাস্থ্য-বিধান:—৩য় সংস্করণ। ৺চুণীলাল বসু প্রণীত ও শ্রীযুক্ত অনিলপ্রকাশ বসু ও জ্যোতিপ্রকাশ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৷৷০ টাকা। প্রাপ্তিস্থান ২৫ নং মহেন্দ্র বসু লেন, শ্যামবাজার।

এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ১৯১৬ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত হয়। তাহার চারি বৎসর পরেই ১৯২০ খৃঃ অব্দে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং গ্রন্থকারের পরলোকগমনের পর এবারে তাঁহার পুত্রদ্বয় কর্ত্তৃক ইহার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইহার তিনটী সংস্করণ প্রকাশিত হওয়াতে দেশবাসী যে ইহার উপকারিতা উপলব্ধি করিতেছেন, তাহা সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। আজ কয়েক বৎসর হইল, তিনি যখন রাঁচিতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন দেশের স্বাস্থ্য (বা অস্বাস্থ্য) বিষয়ে আমার সহিত তাঁহার নিত্যই আলাপ হইত। দেশবাসীর স্বাস্থ্যবিষয়ক দুর্দ্দশা সম্বন্ধে তিনি যে কিরূপ গভীরভাবে চিন্তা করিতেন এবং দেশবাসীর স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনের উপায়সন্ধানে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, আমি সেই সময়েই তাহার বিশেষ পরিচয় পাইয়াছিলাম। আলোচ্য গ্রন্থ এবং "খাদ্য" প্রভৃতি

গ্রন্থ, তাঁহার বহুবর্ষব্যাপী সেই আকুল চিন্তার ফল। গ্রন্থের বাহিরের আকার যেমন সুন্দর, ইহার লিখিত বিষয়গুলিও সেইরূপ সুন্দর ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদিগকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করি যে, তাঁহারা দেশবাসীর স্বাস্থ্যবিধানে ইচ্ছুক হইলে এই পুস্তকখানি যেন প্রবেশিকার জন্য পাঠ্যনির্দ্দিষ্ট করেন। আমরা দেখিয়াছি, স্বাস্থ্যবিধানসম্বন্ধীয় বালোপযোগী পুস্তক নিম্নশ্রেণীতে পাঠ্যনির্দ্দিষ্ট হওয়ায় বালকদিগের বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে। সেইরূপ প্রবেশিকার জন্য এই গ্রন্থের এক-একটা বিশেষ অংশ একএক বৎসরে নির্দ্দিষ্ট হইলেও সমস্ত গ্রন্থই ছাত্রদিগের দৃষ্টি ও মনোযোগ সহজেই আকর্ষণ করিবে। সমস্ত গ্রন্থের ভাব মনের মধ্যে বসিয়া গেলে ছাত্রগণ সংসারে যতই প্রবেশ করিবে, ততই গ্রন্থোক্ত উপদেশগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম হইবে। চূণীলাল বাবুর কৃতী পুত্রগণ গ্রন্থের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন, ইহার জন্য তাঁহারা আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। গ্রন্থটী পনেরো অধ্যায়ে বিভক্ত। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বোধ হয় এমন একটিও প্রয়োজনীয় বিষয় নাই, যাহা এই গ্রন্থে আলোচিত হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদের পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে (কেবল পারিতোষিক পুস্তকের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিলে চলিবে না) অন্তর্ভুক্ত করুন বা নাই করুন, আমরা দেশের হিতকামী প্রত্যেক দেশবাসীকে এই গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। আমাদের বিশেষ ইচ্ছা থাকিলেও স্থানাভাববশতঃ বিস্তৃত সমালোচনায় এই গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা বিশদভাবে দেখাইতে পারিলাম না, ইহার জন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত।

শয়তানের সুমতি :—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় এম-এ প্রণীত। সচিত্র গল্পপুস্তক। মূল্য বারো আনা। প্রাপ্তিস্থান—আশুতোষ লাইব্রেরী; ৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, ঢাকা ও চট্টগ্রাম।

ছেলেদের উপযোগী ছোট গল্পের পুস্তক অনেক আছে; কিন্তু শিক্ষাপ্রদ বড় গল্প বা উপন্যাস তত নাই। আলোচ্য গ্রন্থটী সেই অভাবমোচনে সমর্থ হইয়াছে। গ্রন্থকার ছেলেদের ভাষায় তাহাদের উপযোগী করিয়া এমন নিপুণভাবে নিজ কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়াছেন যে, গ্রন্থটী শেষ না করিয়া উঠা যায় না। পাঠকালে মনেই হয় না যে, গ্রন্থকার ছেলেদের গণ্ডীর বহির্ভূত, শিক্ষকের পর্য্যায়ভুক্ত। ইহাতেই গ্রন্থকারের লেখনীর সার্থকতা।

ভয়ঙ্কর :—শ্রীপ্রেমেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত। মূল্য দশ আনা। প্রকাশক—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার; প্রবোধচন্দ্র মজুমদার এণ্ড ব্রাদার্স। ২২।৫, ঝামাপুকুর লেন,—কলিকাতা।

এই গ্রন্থে ভয়ঙ্কর, বন্ধু, কাণা ও পা-কাড়া শীর্ষক চারিটি কৌতূহলোদ্দীপক গল্প আছে। গল্পগুলি ছেলেদের মাসিক "রামধনু" পত্রিকায় যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখনই যে তাহা শিশুগণের মনোহরণে সমর্থ হইয়াছিল, এবিষয়ে আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। সেই গল্পগুলি এখন সচিত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। গল্পগুলিও যেরূপ কৌতূহলোদ্দীপক চিত্রগুলিও তদ্রূপ নিপুণহস্তে অঙ্কিত। আমরা প্রেমেন্দ্র বাবুর শিশুপাঠ্য অন্য কোন রচনা পূর্ব্বে দেখি নাই। মনে হয় যে, ইহাই তাঁহার প্রথম উদ্যম। আমাদের অনুমান সত্য হইলে বলিতে হইবে যে, তাঁহার প্রথম উদ্যমেই তিনি সুন্দর সাফল্য লাভ করিয়াছেন।

THE INFLUENCE OF INDIAN THOUGHT ON THE THOUGHT OF THE WEST :—স্বামী অশোকানন্দলিখিত। ৪নং, ওয়েলিংটন লেন; অদ্বৈত আশ্রম হইতে প্রকাশিত।

শ্রীযুক্ত রেঁম্যারোলাঁর লিখিত বিবেকানন্দ জীবনীর বিশেষ এক অংশ উপলক্ষ করিয়া এই টিপ্পনী লিখিত হইয়াছে। এই ৪৫ পৃষ্ঠাব্যাপী টিপ্পনীর মধ্যে লেখক স্বামী অশোকানন্দ তাঁহার জ্ঞানের গভীর পরিচয় দিয়াছেন; এবং পাশ্চাত্য চিন্তার উপর প্রাচ্যভাবের গভীর প্রভাব সুস্পষ্টরূপে দেখাইতে সক্ষম হইয়াছেন। পুস্তকখানি একটি নোটের আকারে লিখিত হইলেও ইহা খুবই Suggestive বা অনেক বিষয়ের ইঙ্গিতে পূর্ণ।

হীরের ফুল :—শ্রীযুক্ত মোহাম্মদ মোদাব্বের প্রণীত। দাম—ছয় আনা। প্রাপ্তিস্থান—দি মুসলমান পাবলিশিং কোং লিঃ। ১১।৫ কড়েয়া বাজার রোড,—কলিকাতা।

এই পুস্তিকায় সাতটি গল্প আছে। গল্পগুলির প্রায় সব কয়টিই ইস্‌লামীয় মহাপুরুষগণের জীবনশ্রুতি অবলম্বনে রচিত। গ্রন্থকারের প্রথম উদ্যম হইলেও ইহা ব্যর্থ হয় নাই। মুসলমান সাহিত্যের একটা দিক এইভাবে বঙ্গসাহিত্যে আমদানী করার কারণে আমরা নবীন গ্রন্থকারকে অভিনন্দন করিতেছি। কিন্তু আমাদের একটা বক্তব্য এই—হিন্দুই হই, মুসলমানই হই, আমরা সকলেই যখন বাঙ্গালী, তখন বাঙ্গালী যে ভাষা বলে, সেই ভাষাই ব্যবহার করা উচিত। কোন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত যদি বাংলাতে পুস্তক লিখিতে বসিয়া বাংলায় অপ্রচলিত সংস্কৃতশব্দের বহুল প্রয়োগ

করেন, তাহাও যেরূপ সুখপাঠ্য হয় না, সেইরূপ ইসলামীয় ভ্রাতাগণ বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ লিখিতে গিয়া আর্বী-উর্দ্দু শব্দের বহুল প্রয়োগ করিলে সুখপাঠ্য হইবে না। গ্রন্থের কয়েক স্থলে এই দোষ লক্ষিত হইলেও, অধিকাংশ স্থলই সুবোধ্য।

কল্যাণ—শ্রীকৃষ্ণসংখ্যা— আমরা 'কল্যাণ' নামক হিন্দী মাসিক পত্রের শ্রীকৃষ্ণসংখ্যা পাইয়া সাতিশয় প্রীতিলাভ করিলাম। মাসিক পত্রের সংখ্যা বলিতে যাহা বুঝায় শ্রীকৃষ্ণসংখ্যা তাহা নহে। ইহা ডবল ডিমাই ৮ পেজী ফর্ম্মার ৫২২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ইহা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে একটী cyclopoedia বা বৃহৎ কোষ-অভিধান বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না। ইহাতে আধ্যাত্মিক, ঐতিহাসিক প্রভৃতি নানা দিক হইতে আলোচিত শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় তত্ত্ব ও তথ্যের সমাবেশ করা হইয়াছে। গ্রন্থখানি শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক কামধেনু বা কল্পতরু। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে যিনি যাহা অনুসন্ধান করিবেন, তিনি ইহাতে তদ্বিষয়ক কোন না কোন সত্যের সন্ধান নিশ্চয় পাইবেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, বর্ত্তমান যুগের জনসাধারণ যে দিকটা বেশী দেখিতে চান, সেই ঐতিহাসিক গবেষণার দিক আশানুরূপ আলোচিত হয় নাই। মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় অনেক প্রচলিক বিষয়ের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা একটু অতিরিক্ত মাত্রার সমাবিষ্ট হইয়াছে। ইহার চিত্রগুলি অতীব সুন্দর। কোন বাংলা গ্রন্থে এত অধিক-সংখ্যক ও এরূপ সুন্দর চিত্রের সমাবেশ আমরা দেখি নাই।

কল্যাণসম্পাদক মহাশয় ইতিপূর্ব্বে তাঁহার মাসিক পত্রের গীতাজয়ন্তী সংখ্যা প্রকাশ করিয়াছিলেন। উহাও গীতাসম্বন্ধে একটী প্রকাণ্ড গ্রন্থবিশেষ। এই দুই সংখ্যা সম্পাদকমহাশয়ের কর্ম্মকুশলতার অক্ষয় পরিচয় প্রদান করিবে। ইহার পর এই পত্রের কোন্ কোন্ বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হইবে, আমরা তাহার প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইয়া রহিলাম।

গৃহস্থের সাধন—ডাক্তার শ্রীচণ্ডীচরণ পাল সঙ্কলিত এবং শ্রীমৎ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক ১২নং বৃন্দাবন পালের লেন জ্ঞানানন্দ-ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৷৷৹ বার আনা।

গ্রন্থকার একজন নিষ্ঠাবান গীতাভক্ত। তিনি তাঁহার গুরুদেবের কৃপায় গীতার ভিতর দিয়া যে সকল সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাই উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মূল বক্তব্য এই যে, গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে গীতোক্ত সাধনা অবলম্বনে ধর্ম্মসাধনে আত্মনিয়োগ করা আবশ্যক। মোটামুটি বলিতে পারি, তাঁহার মূল কথার সহিত আমরা একমত। গীতাভক্ত সাধনপিপাসুদিগের নিকট এই গ্রন্থ পরম উপাদেয় লাগিবে। ইহার সর্ব্বশেষে "কলিকাতা নিখিল বঙ্গনারী-সম্মিলনে" সভানেত্রী শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা সংযুক্ত করিবার সঙ্গতি বুঝিলাম না। সম্ভবতঃ দপ্তরীর প্রমাদবশতঃ এই বিভ্রাট ঘটিয়াছে।

বলশেভিকী—শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান আত্মশক্তি লাইব্রেরী, ১৫নং কলেজ স্কোয়ার।

গ্রন্থের আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমরা বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছি। "বলশেভিকী" নাম দেখিয়া আমরা বড়ই ভীত হইয়াছিলাম যে, ইহার যথাযথ সমালোচনা করিতে পারিব কি না। আমাদের মনে বড়ই ভয় ছিল যে, ইহা একখানি রাজনৈতিক গ্রন্থ এবং হয়তো ইহা অনুগ্র অসহযোগের পরিবর্ত্তে অত্যুগ্র ভাবের স্বপক্ষে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই আশ্বস্ত হইলাম। প্রবীণ লেখকের প্রবীণতা গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধা এবং নবীনের প্রতি স্নেহ বলশেভিক সম্বন্ধীয় প্রকৃত তত্ত্বের দিকে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া দিয়াছে। আমরা আমাদের বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে কর্ম্মের বিরাট ভূমির পরিবর্ত্তে জন্মের সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ করিতে চাই বলিয়া আমাদের সমাজে এত বিরোধ-বিবাদের উৎপত্তি হইয়াছে। পূর্ব্বতন ঋষিদিগের ন্যায় আমরাও যদি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকে কর্ম্মগত করিয়া তুলি এবং কথায় কথায় সামান্য দোষ বা বারেক পদস্খলনের জন্য ক্রমাগত আপন-জনকে বিচ্ছিন্ন করিবার পরিবর্ত্তে জগদ্বাসীকে আপন করিয়া লইবার ক্ষমতা ও অধিকার সঞ্চয় করি, তবে বর্ত্তমানে দাসমনভাবের কারণে 'বলশেভিক' নামেই আমরা যেরূপ নৃত্য করিতে থাকি, সেরূপ নৃত্য করিবার কোনই প্রয়োজন থাকিবে না। গ্রন্থকার ঠিকই বলিয়াছেন, অধ্যাত্ম-তত্ত্ব ভারতের বিশেষ ধন; সেই ধনকে আশ্রয় করিয়াই আমাদের সকল কর্ম্মে অগ্রসর হইতে হইবে। মস্তক যদি বিকৃত হয়, তবে সমস্ত শরীরই বিকল হইয়া যায়; কিন্তু মস্তক যদি ঠিক থাকে তবে এক-আধ অঙ্গ বিকল হইলেও তাহার প্রতীকার সম্ভব হয়। আমাদের শাস্ত্রে এই কারণে সকল তত্ত্বের শিরস্বরূপ অধ্যাত্মতত্ত্বসমূহকে শ্রেষ্ঠতম স্থান দেওয়া হইয়াছে। এই কারণে আমাদের দেশে তর্কশাস্ত্রাদিতে উপর হইতে নীচে নামা বা অবরোহপ্রণালী গৃহীত হয়, কিন্তু নীচে হইতে উপরে যাওয়া বা আরোহপ্রণালী অবলম্বিত হইতে দেখা যায় না। আমাদের সামাজিক রীতিনীতিও এই অবরোহপ্রণালীর উপরই প্রতিষ্ঠিত। পাশ্চাত্য সমাজে নব নব উদ্ভাবিত রীতিনীতিগুলি আরোহ-

প্রণালীর পরীক্ষার অগ্নিতে উত্তীর্ণ হইলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, সেগুলির কোন্‌টী অবলম্বনীয় আর কোন্‌টীই বা পরিত্যজ্য। আলোচ্য গ্রন্থে মোটামুটি বলিতে গেলে এই তত্ত্বই বিশদরূপে বোঝান হইয়াছে। আশা করি গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া পাশ্চাত্য মোহে বিশেষতঃ বলষেভিক নামের মোহে মুগ্ধ নবভারতের তরুণসম্প্রদায় দাস মনোভাব পরিহারপূর্ব্বক দেশের যাহা কিছু ভাল আছে, তাহার প্রতি ফিরিয়া চাহিবার মতিগতি লাভ করিবেন এই গ্রন্থ আমরা প্রত্যেক তরুণ যুবকের হস্তে দেখিতে পাইলে সুখী হইব।

সমস্যা ও সমাধান :—শ্রীযুক্ত মোহাম্মদ আক্রাম খাঁ প্রণীত। মূল্য ১৷০ সিকা। প্রাপ্তিস্থান—৯১ নং আপার সার্কুলার রোড্—কলিকাতা।

এই গ্রন্থখানির নাম বিষয়ের উপযোগী হইয়াছে। ইহাতে চারিটী বিষয়ের সমস্যা উপস্থিত করা হইয়াছে; এবং মুসলমানদিগের শাস্ত্র অনুসারে বিশেষতঃ কোরাণের উপর দাঁড়াইয়া এই চারিটী সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হইয়াছে। জনাব মহম্মদ আক্‌রাম খাঁ মুসলমান-শাস্ত্রে যেরূপ সুপণ্ডিত, তাহাতে তাঁহার নিকট উপযুক্ত সমাধানই পাওয়া গিয়াছে। প্রথম সমস্যা "এসলামে নারীর মর্য্যাদা ও অধিকার"। ইহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে, মুসলমান শাস্ত্রে নারীকে উচ্চ মর্য্যাদা ও অধিকার দেওয়া হইয়াছে। তিনি দু'এক স্থলে অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত এসলাম শাস্ত্রের তুলনা করিয়া শেষোক্ত শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠতা দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন, এই স্থলে তর্কবিতর্ক করিবার স্থান নাই, সুতরাং কোন্ শাস্ত্র শ্রেষ্ঠ এবং কোন্ শাস্ত্র অশ্রেষ্ঠ, এস্থলে সে বিষয়ের আলোচনা করিতে বিরত রহিলাম। তবে আমরা এইটুকু বলিতে পারি যে, আমাদের শাস্ত্রে সমগ্র স্ত্রীজাতিকে মাতৃত্বের আসনে বসাইয়া অতি উচ্চ মর্য্যাদা ও অধিকার প্রদান করা হইয়াছে। আমরা বিবেচনা করিতাম যে, কোরাণশাস্ত্র অনেক বিষয়ে মানবের অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক ভাবের উপর দণ্ডায়মান। আক্‌রাম খাঁ সাহেবের আলোচ্য নিবন্ধে আমাদের সেই বিশ্বাস দৃঢ়রূপে সমর্থিত হইয়াছে দেখিয়া সুখী হইলাম। দ্বিতীয় সমস্যায় সুদ লওয়া বিষয়ে তিনি দেখাইয়াছেন, সুদ লওয়া কোরাণবিরুদ্ধ হিন্দুশাস্ত্রেও সুদ লওয়ার বিরুদ্ধে কঠোর শপথ দেওয়া আছে। কিন্তু বর্ত্তমান সমাজ যেভাবে গঠিত, তাহাতে স্বভাবতঃ সুদ লওয়া বন্ধ হইতে পারে না। এস্থলে কি হিন্দুশাস্ত্র, কি এসলাম শাস্ত্র স্বভাবের বিরুদ্ধে গিয়াছেন বলিয়া কোনটাই ইহার গতি প্রতিরুদ্ধ করিতে পারেন নাই, যদি জনাব সাহেব সুদ লওয়ার উপযুক্ত গতি বা proper direction এসলাম শাস্ত্র হইতে দেখাইতে পারিতেন, তবে বোধ হয় তিনি মুসলমান সমাজকে নবতর মঙ্গলের পথে পরিচালিত করিতে পারিতেন। তৃতীয় সমস্যায় সঙ্গীতবিষয়ে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা বুঝিয়াছি যে, মন্দ সঙ্গীত পরিত্যাজ্য এবং ভাল সঙ্গীত শিক্ষণীয়। ইহাই তো ঠিক কথা। কারণ ইহা মানবহৃদয়ের স্বাভাবিক বৃত্তির উপর দণ্ডায়মান। ভগবান কর্ত্তৃক মানবাত্মায় নিহিত সাধুবৃত্তিসমূহের বিরুদ্ধে যে শাস্ত্রে যাহাই কেন বলা হউক না, আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, তাহা কখনই স্থায়ী হইতে পারিবে না, যথাসময়ে পরিত্যক্ত হইবেই। সঙ্গীতশিক্ষা এসলাম শাস্ত্রের বিরোধী হইলে মুসলমান বাদসাহ প্রভৃতির সভায় এবং মুসলমান ওস্তাদগণের মধ্যে উহা যেপ্রকার প্রসার ও উন্নতিলাভ করিয়াছিল, তাহা কখনই সম্ভব হইত না। গ্রন্থোক্ত চতুর্থ সমস্যা চিত্র বিষয়ে। ইহার প্রথমাংশ পড়িয়া আমরা বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম যে, ইসলাম-শাস্ত্রে চিত্রবিষয়ে সমস্যারও সমাধান করা হইয়াছে মানবের স্বাভাবিকতার উপর দাঁড়াইয়া। কিন্তু এই নিবন্ধের শেষাংশে যে মীমাংসা করা হইয়াছে, তাহার সহিত প্রথমাংশের সম্পূর্ণ মিল দেখিতে পাইলাম না। সাধারণত বস্ত্রে জীবজন্তু অঙ্কিত থাকিলে নির্দ্দোষ হইবে, কিন্তু উহা দেওয়ালে টাঙ্গাইলে সদোষ হইবে—ইহার কারণ ও তত্ত্ব একটু বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলে ভাল হইত।

যাই হোক, আমরা এই গ্রন্থখানির প্রকাশে বড়ই সুখী হইয়াছি। তাহার একটি প্রধান কারণ, ইহা হিন্দু ও মুসলমান সমাজ হইতে সাম্প্রদায়িকতা দূরীকরণে বিশেষ সহায়তা করিবে। গ্রন্থের ভাষা বিশুদ্ধ এবং লিখনভঙ্গী সুন্দর। ইহাতে কোন সম্প্রদায়ের প্রতি তিলমাত্র বিদ্বেষের ভাব পরিলক্ষিত হয় না। আমরা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের নেতৃবৃন্দকে এই গ্রন্থপাঠে অনুরোধ করি।

ইঙ্গিত :—শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম-এ প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান :—বরদা এজেন্সী, কলেজষ্ট্রীট মার্কেট—কলিকাতা।

গ্রন্থখানির নাম দেওয়া হইয়াছে "ইঙ্গিত"। আমরা কিন্তু ইহার নাম দিতে চাই "রত্নহার"। ইহাতে আট-ত্রিশটী বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রত্যেকটী এক-একটী রত্নবিশেষ। সমগ্র গ্রন্থে পবিত্রভাবে সুমঙ্গল বায়ু প্রবহমান। ইহার ভাষাও অতি সুন্দর। এই গ্রন্থ প্রত্যেক বালক-বালিকার পাঠোপযোগী; আশা করি, ইহা বিদ্যালয়সমূহে ছাত্রদিগকে পারিতোষিকরূপে বহুল বিতরিত হইবে।

কিরূপে রোগী দেখিতে হয়—সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ন্যাশ-কৃত How to take the case গ্রন্থের অনুবাদ। মূল্য বার আনা। প্রাপ্তিস্থান ভারত পাব্লিশিং হাউস, ২৭ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।

আমরা যতদূর দেখিলাম তাহাতে মনে হয়, অনুবাদটী সুন্দর ও সুখবোধ্য হইয়াছে। ইহা দ্বারা ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথি-চিকিৎসক এবং চিকিৎসার্থী উভয়ই বিশেষ উপকৃত হইবেন। আমাদের দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে হোমিওপ্যাথির ন্যায় সুলভ অথচ ফলদায়ক চিকিৎসাই অবলম্বন করা ব্যতীত আর কোন উপায় দেখি না। সেই জন্য হোমিওপ্যাথি-চিকিৎসাসম্বন্ধীয় গ্রন্থ যতই সুবোধ্য ভাষায় লিখিত ও প্রকাশিত হইবে, ততই আমরা আনন্দিত হইব।

রাসলীলা :—শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য আট আনা। প্রাপ্তিস্থান শান্তিপুর, নদীয়া।

এই ৩৮ পৃষ্ঠা ব্যাপী পুস্তিকার সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন। গ্রন্থকার রাসলীলা ও গোষ্ঠবিহার সম্বন্ধীয় পুরাতন তত্ত্ব নূতন ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীকীর্ত্তনকুসুমাঞ্জলি বা সাধনতত্ত্বসার :—কথক শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল বিদ্যারত্ন প্রণীত। মূল্য—১৲ এক টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শান্তিপুর, নদীয়া।

গ্রন্থখানি সংকীর্ত্তনের তত্ত্ববিষয়ক একখানি ক্ষুদ্র কোষ-গ্রন্থ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। সংকীর্ত্তন বিষয়ক প্রায় সকল তত্ত্বেরই বিবরণ ও প্রণালী ইহাতে বিবৃত হইয়াছে; সুতরাং ইহা বৈষ্ণব সাধকদিগের বিশেষ উপাদেয় লাগিবে নিঃসন্দেহ। তবে তিনি যে সকল কীর্ত্তনপদাবলী উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেগুলির রচয়িতাগণের নাম উল্লিখিত না থাকায় প্রাচীন পাঠের সহিত গ্রন্থের পাঠ মিলাইয়া দেখা সুসাধ্য হইল না। সে ভার আমরা কীর্ত্তনগায়ক ও বৈষ্ণব-সাধকদিগের উপর ন্যস্ত করিলাম।

জ্ঞানের প্রদীপ :—শ্রীরামচন্দ্র দত্ত বিদ্যাভূষণ তত্ত্বনিধি প্রণীত। মূল্য ।০ চারি আনা। প্রাপ্তিস্থান—আম্রতলা পোঃ ছয়ঘরিয়া,—খুলনা।

ইহা ৪৬ পৃষ্ঠার একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা এবং গ্রন্থকারের "সংসার-ধর্ম্ম ও গৃহচিকিৎসা" পুস্তকের পরিশিষ্টরূপে লিখিত। তিনি ঠিকই লিখিয়াছেন যে, ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে সংসারধর্ম্ম সুচারুরূপে প্রতিপালন করা অসম্ভব। এই উদ্দেশ্যে তিনি ধর্ম্মের অনেক তত্ত্ব অতীব সংক্ষিপ্ত আকারে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা গত সংখ্যায় "সংসারধর্ম্ম ও গৃহচিকিৎসা"র সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছি। ঐ গ্রন্থ যাঁহারা পাঠ করিবেন, তাঁহাদের নিকট এই পুস্তিকাখানি বিশেষ সমাদৃত হইবে। আমাদের পুস্তিকাখানি ভালই লাগিয়াছে।

সোভিয়েট রাশিয়া :—শ্রীসুধীরচন্দ্র বসু এম-এ কর্ত্তৃক অনুবাদিত। মূল্য—এক টাকা। প্রাপ্তিস্থান—আত্মশক্তি লাইব্রেরী; ১৫নং, কলেজ স্কোয়ার—কলিকাতা।

এই পুস্তকখানি শ্রীযুক্ত জহরলাল নেহেরু প্রণীত "সোভিয়েট রাশিয়া" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদটী আমরা আদ্যোপান্ত পড়িয়া দেখিলাম। অনুবাদের ভাষা অতি পরিপাটী হইয়াছে। নেহেরু-মহোদয়ের গ্রন্থটী প্রধানতঃ সোভিয়েট রাশিয়ার বহিরাকার বিষয়েই লিখিত। সমস্ত দেহ পরিপুষ্ট ও সুস্থ থাকিলে মস্তিষ্ক যেরূপ সবল থাকিবার সম্ভাবনা, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, সোভিয়েট রাশিয়ার শাসনপদ্ধতি, শিক্ষাপদ্ধতি প্রভৃতি বহিরঙ্গ-সকল উন্নতির অভিমুখে পরিচালিত হইতে হইতে পরিণামে ইহারা সমগ্র দেশকে এক অভূতপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক উন্নতির শিখরে উপনীত করিবে। আলোচ্য গ্রন্থে সোভিয়েট রাশিয়ার সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক তথ্যসমূহ বেশ একটু নূতনভাবে চিত্রিত হইয়াছে। আমরা এই একটি চিন্তা করিয়া আনন্দিত হইতেছি যে, বর্ত্তমান রুশিয়া সম্বন্ধীয় নানা গ্রন্থ প্রকাশের ফলে ভারতবাসীর মস্তকে ইতিপূর্ব্বে রুশভীতির যে পাষাণ চাপান ছিল, তাহা অনেক পরিমাণে অপসারিত হইয়াছে।

স্বামী-শিষ্যপ্রসঙ্গ—১ম ও ২য় খণ্ড। স্বামী ধ্রুবানন্দ গিরি-লিখিত। মূল্য যথাক্রমে ছয় আনা ও ১৲ টাকা। লালতারা-বাগ, হরিদ্বার হইতে প্রকাশিত।

প্রথম খণ্ডের নিবেদনে একস্থানে রচয়িতা যাহা বলিয়াছেন তাহার সহিত আমরাও একমতে বলি যে, সাধনপথের—প্রকৃত মোক্ষপথের অগ্রগামী পথিক হইতে চাহিলে দ্বৈত-অদ্বৈত এবং অন্যান্য শত মতবাদ লইয়া কলহবিবাদ করা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু গ্রন্থকার তাঁহার পাঁচ পৃষ্ঠাব্যাপী নিবেদনে গীতোক্ত মতামত লইয়া তর্কবিতর্কের দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করায় পাঠকদিগের অন্তরে বিরোধ আসিবার অবসর প্রদান করিয়াছেন। শ্রীমৎভোলানন্দ গিরির যে স্বল্পসংখ্যক বাক্যাবলী সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার অনেকগুলিই সাধনপথের পথিকদিগের বিশেষ উপকারে আসিবে। আমরা জানি, শ্রীমৎভোলানন্দের অনেক শিষ্য ভারতে অন্ততঃ বঙ্গদেশের চারিদিকে বহু বিস্তৃতভাবে ছড়াইয়া আছেন। তাঁহাদিগের নিকট হইতে তাঁহার উপদেশাবলী সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলে ভাল হয়। উহাতে গুরু-শিষ্যসংবাদের নাটকীয় আকার না দিলেও চলিতে পারে। এরূপ গ্রন্থে বিসূচিকা দেবীর একাগাড়ীতে চড়িয়া আবির্ভাব এবং অপর এক সাধুর আদেশে সেই একার

যোড়া মারিয়া তিরোভাব-বিষয়ক উপাখ্যান স্থান না পাইলেই ভাল হইত। কারণ সেগুলি শ্রীমৎভোলানন্দের শিষ্যগণের নিকট বিশ্বাসযোগ্য বোধ হইলেও বর্ত্তমান যুগে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনসাধারণের নিকট বিশ্বাসযোগ্য হইবে বলিয়া কিছুতেই মনে করিতে পারি না।

শ্রীশ্রীগঙ্গাদেবীর অষ্টোত্তরশতনাম—অনুবাদক শ্রীচণ্ডীচরণ পুরাণতীর্থ। মূল্য দুই আনা। প্রাপ্তিস্থান পোঃ পলাশবন, জেলা বর্দ্ধমান।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ পুরাণতীর্থ ভাগবত পুরাণোক্ত গঙ্গার একশত আট নাম তাহার গদ্য ও পদ্যানুবাদ-সহ প্রকাশ করিয়াছেন। অনুবাদগুলি আধুনিক কালের ঠিক উপযুক্ত না হইলেও উহার দ্বারা সংস্কৃত শ্লোকগুলি বুঝিবার বেশ সুবিধা হইয়াছে। গঙ্গাপূজার মন্ত্রগুলিও ইহার শেষাংশে সন্নিবিষ্ট হওয়ায় হিন্দু মাত্রেরই উপকারে আসিবে। আমাদের মনে হয়, এই পুস্তিকার শেষাংশে সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গাস্তোত্রগুলিও সানুবাদ সংযোজিত করিয়া দিলে পুস্তিকাটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত।

অধ্যাত্ম-বিদ্যা—স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি-লিখিত; মূল্য ॥০ আট আনা। প্রাপ্তিস্থান লালতারা-বাগ, হরিদ্বার।

গ্রন্থখানি শ্রীমৎভোলানন্দ গিরির অধ্যাত্মবিষয়ক সদুপদেশে পূর্ণ। কয়েকটী স্থল ব্যতীত উপদেশগুলি আমার বড়ই ভাল লাগিল। শ্রীমৎমহাদেবানন্দ গিরি সর্ব্বজনমান্য তাঁহার গুরুদেবের উপদেশগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে চিনিবার সুবিধা দিয়াছেন এবং সাধনপিপাসুদিগের মহোপকার করিয়াছেন। একটী উপদেশে আছে, 'গুরুবাক্য অবিচারিতভাবে গ্রহণ করিতে হইবে'। বোধ হয়, ইহা অক্ষরশঃ স্বীকার করিতে হইবে এরূপ বলা শ্রীমৎভোলানন্দের উদ্দেশ্য নহে; কারণ তাহা যদি হইত তবে সদ্‌গুরুনির্ব্বাচন লইয়া কোন উপদেশ অথবা এক গুরু ছাড়িয়া শিষ্যের অপর গুরু গ্রহণ করার দৃষ্টান্তও শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যাইত না; যে গীতা অবলম্বনে শ্রীমৎভোলানন্দের উপদেশ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সেই গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণের অনেক উক্তি-সম্বন্ধে অর্জ্জুনের সংশয় উঠিবার কথাই থাকিতে পারিত না। আমরা অন্ধভক্তির পক্ষপাতী নহি। 'যুক্তিহীন বিচারের ফলে ধর্ম্মহানি হয়' মনুসংহিতার এই উক্তি আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।

ভাগবত-কুসুমাঞ্জলি—রায়বাহাদুর পণ্ডিত শ্রীগোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কবিরত্ন-প্রণীত। মূল্য ১।০ পাঁচসিকা। প্রাপ্তিস্থান "কমলকুঞ্জ"; ১১নং পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা।

গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া ভক্তিসাগর গ্রন্থকারের কৃষ্ণনিবেদিতচিত্তের ভক্তির বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি। তিনি যথার্থ ভক্তের প্রাণে ভাগবত আলোচনা করিয়াছেন বলিয়াই এই গ্রন্থের শ্লোকগুলি অন্বয়মুখী ব্যাখ্যা এবং বঙ্গানুবাদ এত সরল ও সুখবোধ্য করিতে পারিয়াছেন। আমরা আশা করি, তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া এই-রূপ অনেক গ্রন্থ প্রকাশপূর্ব্বক ভক্তিপিপাসুদিগের উল্লাসবর্দ্ধন করিবেন।

জাতিভেদ :—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার-সম্পাদিত। মূল্য—।০ চারি আনা। প্রাপ্তিস্থান—কটন্ লাইব্রেরী, ঢাকা।

পুস্তিকাখানি পড়িয়া মনে হয়, যেন কোন সভায় বক্তৃতাকারে পঠিত বা তদুদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছে; সুতরাং বলা বাহুল্য, ইহা হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। লেখকের মত সর্ব্বশেষে প্রকাশ পায় যে, গুণকর্ম্ম অনুসারে জাতিভেদ হওয়া কর্ত্তব্য; এবং প্রাচীন ভারতে তাহাই প্রচলিত ছিল। আমরা তাঁহার সহিত এবিষয়ে একমত। প্রাসঙ্গিকভাবে লেখককে জাতিভেদের ইতিহাস সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলিতে হইয়াছে। সেই সকল কথায় জাতিভেদসম্বন্ধীয় শাস্ত্রোক্ত নানা ঐতিহাসিক তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। নবভারতের সমাজকে নবতর গঠন দিবার প্রয়াসী নেতৃবৃন্দকে এই পুস্তিকাখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। পুস্তিকাখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও তাঁহাদের বিশেষ উপকারে আসিবে।

মর্ম্মনির্ঝর :—শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ১১নং পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা—'কমলকুঞ্জ' হইতে প্রকাশিত।

পুস্তিকাখানির "মর্ম্ম-নির্ঝর" এই নামকরণ উপযুক্ত হইয়াছে। ইহা ভাবুকের মর্ম্ম-উৎস হইতে উৎসারিত কয়েকটী ভাবকণিকায় সংরচিত। ভাবকণিকাগুলি সমস্তই বলিতে গেলে ভগবানের চরণাভিমুখী; সুতরাং বলা বাহুল্য, এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার মধ্যে পবিত্রতার সুমঙ্গল বায়ুহিল্লোল প্রবহমান। ইহা পড়িতে পড়িতে চিত্তকমলে প্রগাঢ় শান্তি আসিয়া আধিষ্ঠিত হয়।

পূর্ণ-জ্যোতি :—স্বামী পূর্ণানন্দ-কথিত এবং চক-বাজার বরিশাল হইতে শ্রীমতিলাল সেন বি-এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

গ্রন্থে সাধারণতঃ ধর্ম্মপথের পথিক কি প্রকার সাধনের দ্বারা অগ্রসর হইবেন, তাহাই স্থূলভাবে উল্লিখিত

হইয়াছে। একজন প্রকৃত সাধকের উপদিষ্ট বাণী বলিয়া ইহার যথেষ্ট মূল্য আছে। ঐ সকল বাণী সংস্কৃত শ্লোকের আকারে নিবদ্ধ বলিয়া উহার বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। শ্রদ্ধাবান সাধুহৃদয় ব্যক্তিগণ এই গ্রন্থোক্ত উপদেশের দ্বারা লাভবান হইবেন নিঃসন্দেহ।

চলন্তিকা—শ্রীরাজশেখর বসু সঙ্কলিত। মূল্য ২৸৹ আনা। প্রাপ্তিস্থান এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স; ১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয় ৺চন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ের অন্যতর পুত্র। চন্দ্রশেখর বাবু একদিকে বর্দ্ধমান রাজসরকারে কর্ম্মোপলক্ষ্যে স্বীয় কর্ম্মপটুতার সুপরিচয় দিয়াছেন; সেইরূপ তিনি তাঁহার "অধিকার-তত্ব" "বেদান্তপ্রবেশ" প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার সাহিত্যপ্রিয়তা, রচনা-শক্তি ও ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে গভীর অভিজ্ঞতার সুপরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার পুত্র রাজশেখর বাবুও "বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসে"র সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানে বলিতে গেলে একচ্ছত্রী পরিচালকরূপে অবস্থিত থাকিয়া একদিকে কর্ম্মদক্ষতার আশ্চর্য্য পরিচয় দিতেছেন, অপর দিকে এই 'চলন্তিকা' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে গভীর অভিজ্ঞতার সুস্পষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। সুবিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যে নিমগ্ন থাকিয়াও এই গ্রন্থপ্রকাশে তাঁহার যথেষ্ট শক্তিমত্তাও প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা যখন বিদ্যালয়ে পড়িতাম তখন "Slang Dictionary" নামক ইংরাজী চলিত ভাষার একখানি অভিধান দেখিয়াছিলাম। সেই অবধি বাঙ্গালা ভাষায় ঐরূপ একখানি অভিধান প্রণয়ন করার ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম। আলোচ্য গ্রন্থখানি আমার সেই ইচ্ছা একপ্রকার পূর্ণ করিয়াছে বলিতে পারি। আমরা পরীক্ষার্থ কয়েকটী শব্দ ইহাতে দেখিবার জন্য চেষ্টা করিলাম; সেই সব শব্দ অন্য বড় বড় অভিধানে পাইলাম না, কিন্তু সেইগুলির প্রত্যেকটী এই গ্রন্থে পাইলাম। গ্রন্থকার এই গ্রন্থে ব্যাকরণঘটিত, বানান-ঘটিত প্রভৃতি বঙ্গভাষাসম্বন্ধীয় বিবিধ তত্বসকল যে প্রণালীতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং অনেক শব্দের অর্থ দৃষ্টান্তাদির দ্বারা যে প্রকার সহজে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে কেবল সাহিত্যসেবী নহে, কিন্তু বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের নিকটেও ইহার উপকারিতা সম্যক্ পরিস্ফুট হইবে। বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের প্রতি যাঁহাদের কিছুমাত্র অনুরাগ আছে, তাঁহাদের প্রত্যেককে আমরা এই গ্রন্থের একএকখানি নিঃসঙ্কোচে ক্রয় করিবার জন্য অনুরোধ করিতে পারি। ইহার একখানি সঙ্গে থাকিলে অনেক বড় বড় অভিধান কিনিবার প্রয়োজন থাকিবে না।

মহেশ্বরপাশাপরিচয়—ডাঃ শ্রীখগেন্দ্রনাথ বসু কাব্যবিনোদ সাহিত্যভূষণ সঙ্কলিত। মূল্য ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান মহেশ্বরপাশা, খুলনা; এবং ৫২সি, বেণীনন্দন ষ্ট্রীট, ভবানীপুর।

আমরা গ্রন্থকার খগেন্দ্রবাবুকে এবং এই ইতিহাস-লিখনে তাঁহার পরামর্শ ও উৎসাহদাতা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়কে অন্তরের সহিত অভিনন্দন করিতেছি। গ্রন্থখানি আমরা আদ্যোপান্ত পড়িয়া দেখিলাম এবং উহার তৃতীয় অধ্যায় আমরা বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলাম। গ্রন্থখানি সুলিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার ও ভূমিকালেখক মহাশয়দ্বয়ের সহিত আমরাও দেশবাসী-গণকে অনুরোধ করি যে, তাঁহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ দেশের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করুন। সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক মোক্ষমূলারের কথা আমরা সকলকে অন্তরে ধারণ করিবার জন্য অনুরোধ করি যে, নিজ নিজ প্রাচীন ইতিহাস ও কীর্ত্তিকলাপের প্রতি দৃষ্টি না ফিরাইলে কোন জাতি বা দেশের উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। জার্ম্মণীর উন্নতি এই সত্যবাণীর জলন্ত সাক্ষ্য দিতেছে। বর্ত্তমানে ভারতে যে প্রকার উন্নতির প্রচেষ্টা চলিতেছে তৎসাধনে সহায়তা করিতে চাহিলে অলসতায় কালক্ষেপণ করিবার উপযুক্ত নাটক, উপন্যাস, নবন্যাস প্রভৃতি গ্রন্থাদি প্রকাশ করা যত্নে স্থগিত রাখিয়া প্রতি পল্লীর প্রতি নগরের ইতিহাসসংগ্রহে যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। "আমোদপ্রমোদ" পরিচ্ছেদে থিয়েটার প্রভৃতিরই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু দেশের চিরন্তন খেলা "কপাটি" প্রভৃতির কোনই উল্লেখ নাই। এগুলির উল্লেখ করিলে ভাল হইত। খুলনা একটি প্রসিদ্ধ জেলা, বিশেষতঃ দৌলতপুর-কলেজ স্থাপন এই জেলার খ্যাতি সমধিক বর্দ্ধিত করিয়াছে। আমরা দেশের ঐতিহাসিক তথ্যের অনুসন্ধিৎসু প্রত্যেককে এবং স্কুল-কলেজ প্রভৃতির প্রত্যেক লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষদিগকে এই গ্রন্থসংগ্রহে অনুরোধ করি। দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থা বিবেচনা করিয়া আমরা গ্রন্থকার ও প্রকাশকদিগকে বলিতে চাই যে, তাঁহাদের ঈপ্সিতমত বিক্রয় না দেখিলে যেন এতদ্বিধ অন্যান্য গ্রন্থপ্রকাশে নিরস্ত না হন। এইরূপ গ্রন্থের শেষে বিলাতী পুস্তকগুলির অনুকরণে ইনডেক্স বা বিষয়সূচী দিলে ভাল হয়।

সংবাদ।

কবি রবীন্দ্রনাথের উপাধিলাভ।—কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণ সমবেত হইয়া পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথকে সম্প্রতি "কবি-সার্ব্বভৌম" উপাধি প্রদান করিয়াছেন। এই উপলক্ষে গত ৩রা আশ্বিন, রবিবার, অপরাহ্নে কলেজের দ্বিতলকক্ষে একটী সভার আয়োজন হইয়াছিল। তথায় সহরের বহু গণ্যমান্য মনীষীগণের সমাগম হইয়াছিল। এই সভায় কবি রবীন্দ্র নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতকে অবশ্য পাঠ্য করিবার স্বপক্ষে সুন্দর যুক্তিপূর্ণ একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতাপদে বৃত হইয়া এই পুরাতন প্রতিষ্ঠানটীকে নব-প্রেরণা ও প্রাণরসে সঞ্জীবিত করিয়া যুগোচিত কর্ম্মে উদ্যমশীল করিয়া তুলিতেছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইতেছি।

রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিবার্ষিকী।—গত ২৭শে সেপ্টেম্বর (১০ই আশ্বিন) রবিবার, অপরাহ্নে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের অষ্টনবতিতম সাম্বৎসরিক মৃত্যুদিবস উপলক্ষে রামমোহন লাইব্রেরী ও এলবার্ট হলে দুইটী মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। শেষোক্ত স্থলে সভাপতি হইয়াছিলেন আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র রায় এবং বক্তা ছিলেন হেরম্বচন্দ্র, কামাখ্যানাথ, ক্ষিতীন্দ্রনাথ-প্রমুখ মনীষীগণ। ক্ষিতীন্দ্রনাথের অসুস্থতানিবন্ধন "যুগাবতার রামমোহন" বিষয়ক প্রস্তাবটী পণ্ডিত শ্রীসুরেশ-চন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ কর্ত্তৃক পঠিত হইয়াছিল।

রাজার মৃত্যুদিবসের শতবার্ষিক উৎসবের আর দুইটী বর্ষ মাত্র বাকী রহিল। এই উৎসবের উদ্যোগ-আয়োজনে কেবল ব্রাহ্মসমাজের শাখাত্রয় নয়, কিন্তু হিন্দুমুসলমান-নির্ব্বিশেষে সমগ্র ভারতবাসীরই অগ্রসর হওয়া উচিত। মহামতি গোখেলের ভাষায় 'রাজা রামমোহন রায়ই নব্য ভারতের জন্মদাতা'। সুতরাং আশা করি এবং ইহা সুসঙ্গত যে, নব্যভারত জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে এই মহাপুরুষের স্মৃতিতর্পণে অগ্রসর হইবে। সংবাদপত্রে যথোচিত আলোচনা পূর্ব্বক এবিষয়ে যাহাতে সত্বর একটী কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়, তদ্বিষয়ে সকলের যত্নবান হওয়া বাঞ্ছনীয়। নব্যভারতের গুরু ও উপদেষ্টা রাজা রামমোহন রায়ের শতবার্ষিক উৎসব যাহাতে পূর্ণাঙ্গ হয়, এখন হইতে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে রামমোহন লাইব্রেরীর অনুষ্ঠিত সভায় শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ও তাঁহার বক্তৃতায় এই ভাবেরই কথা উপস্থিত করিয়াছিলেন।

শোকসংবাদ।

৺ইন্দুপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়।—আমরা গভীর দুঃখের সহিত অবগত হইলাম যে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভ্রাতা, ৺গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দৌহিত্র ইন্দুপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় গত ৭ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার রাত্রি ১২টার সময় ১৭১নং লোয়ার সাকুলার রোডস্থ স্বকীয় বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। বাল্যকালে মাতুলালয়ে অবস্থানকালে ইহাঁর উপনয়ন ও দীক্ষা আদিব্রাহ্মসমাজের একেশ্বরবাদ-সম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। আমরা ইহাঁর শোকার্ত্ত পরিজনবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবৎ কৃপায় ইহাঁর লোকান্তরিত আত্মা সাধনোচিত ধাম লাভ করুক।

দানপ্রাপ্তি।

ডাঃ শ্রীশচীকুমার চট্টোপাধ্যায় তদীয় নবকুমারী গীতাঞ্জলীর অন্নপ্রাশন ও নামকরণ উপলক্ষ্যে আদি-ব্রাহ্মসমাজে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে উহার প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি।

একমেবাদ্বিতীয়ং

১৭৬৫ শক ১লা ভাদ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ত্রয়োবিংশ কল্প—প্রথম ভাগ

সংখ্যা ১০৬০

১৮৫৩ শক অগ্রহায়ণ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা।

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"
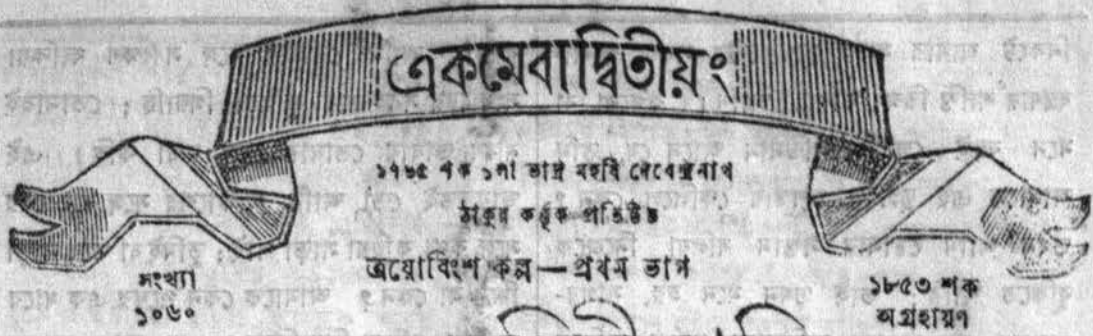
৮৯তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০২। সাল ১৩৩৮। শক ১৮৫৩। খৃঃ ১৯৩১। সম্বৎ ১৯৮৮। কলিগতাব্দ ৫০৩২।

মাতৃমঙ্গল।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১৩। অন্তর।

মা! তোমার কোলে আমি বড় আরামেই শুইয়াছিলাম, সুখে নিদ্রা দিতেছিলাম। আমাকে তুমি জাগাইয়া তুলিলে কেন? আমার অমন সুখের নিদ্রা তুমি ভাঙ্গাইলে কেন? অত ভোরে আমার জীবন ফুটিয়া উঠিতে না উঠিতে আমার ঘুম ভাঙ্গাইয়া, আমাকে তোমার কোল হইতে নামাইয়া কোথায় যে লুকাইয়া পড়িলে, তাহার কোনই ঠিকানা নাই। আমার অন্তরের ক্ষুৎপিপাসা কে বিদূরিত করিবে? ক্ষুৎপিপাসার তাড়নায় আমি এদিকে ওদিকে চারিদিকেই তোমাকে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছি, কোথাও তোমাকে খুঁজিয়া পাইলাম না। তুমি যখন নিকটে আস, তখন তোমার মুখের জ্যোতিতে আমার চক্ষু অন্ধ হইয়া যায়। আবার তুমি যখন দূরে চলিয়া যাও, তখন মসীবর্ণ ঘন অন্ধকার আমাকে ঘিরিয়া ফেলে। তোমার স্নেহপ্রেমে পরিপুষ্ট হইয়া যখন সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে বাহির হইয়া পড়িলাম, তখন কতবার যে নিরর্থক ও নিষ্ফল কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া দিবসের শেষে ব্যর্থকাম হইয়া অশ্রু ফেলিতে ফেলিতে তোমার চরণতলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, তাহা বলা যায় না। তুমিও ততবারই স্নেহহস্তে অশ্রু মুছাইয়া আমাকে সজীব করিয়া সংসারে ফিরাইয়া পাঠাইয়াছ। জন্ম অবধি মা! তোমাকেই আমি জানি—তুমি নিকটেই থাক আর দূরেই থাক, আমি ঠিক জানি, তোমার অনিমেষ দৃষ্টি সর্ব্বদাই আমার দিকে নিপতিত আছে; তাই কিছুতেই আমি ভয় পাই না—অন্ধকারই আমাকে ঘিরিয়া থাক বা উজ্জ্বল আলোকে আমার পথ আলোকিত হউক, জীবনের জ্যোতিতেই আমার প্রাণ উচ্ছ্বসিত হউক বা মরণের যাতনায় প্রাণ ব্যথিতই হউক।

১৭। অশ্রু।

মা! আমার ক্রন্দনের তো শেষ নাই। এত অশ্রুই বা কোথা হইতে পাইয়াছিলাম, তাহা জানি না। দিন নাই, রাত নাই, চোখের জল ঝরিতেছে তো ঝরিতেছেই। চোখের জলে সর্ব্বাঙ্গ ভাসিয়া গেল, সমস্ত ঘর-দুয়ার ভাসিয়া গেল, তবুও থামিবার নাম নাই। কখনো বা মনে হয়, নির্ঝরিণীর মত কাঁদিতে কাঁদিতে তোমার কাছে গিয়া তোমার চরণে আমার সমস্ত অশ্রুধারা নিবেদন করিয়া আমি নিশ্চিন্ত হই, আর তোমার

নিকটে আমার সমস্ত দুঃখকষ্টের সকল জ্বালা-যন্ত্রণার শান্তি ভিক্ষা করিয়া আনি। কখনো বা মনে বড়ই ক্ষোভ অভিমান আসে যে, তুমি আমাকে এই দুঃখের অবস্থায় ফেলিলে কেন? তখন আমি তোমার সন্তান বলিয়া নিজেকে বুঝিতে পারি; তাই তখন মনে হয়, সাগর-তরঙ্গের মত রোষে অভিমানে গর্জ্জন করিতে করিতে তোমার কাছে গিয়া মুখ ফুলাইয়া কাঁদিতে থাকিব, দেখিব, মা সন্তানের দুঃখকষ্ট দূর করেন কি না, জ্বালাযন্ত্রণা নির্ব্বাণ করেন কি না। মা—মা! আমার মনের এই উদ্ধত ভাব দূর করিয়া দাও। এই রকম ভাবের ভারে আমি দাঁড়াইতে পারি না—কি এক অজানা ভয়ের সঙ্গে তোমার প্রতি গভীর ভালবাসার দ্বন্দ্ববিবাদে প্রাণটা আনচান করিয়া উঠে। সংসারে কলহবিবাদ অনেক করিয়াছি। আর না। এখন প্রাণের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা, তোমার কোলে আশ্রয় লইয়া তোমারই স্নেহের কোমল হস্তে আমার অশ্রু মুছাইয়া লই। তাহা হইলেই আমার প্রাণে অবিরাম শান্তি বিরাজমান থাকিবে। তখন তোমার চরণধূলিই আমার খেলার নিত্যসঙ্গী হইবে—আমি বাঁচিয়া যাইব। তখন তোমার নয়নের এক এক ইঙ্গিতে আমার প্রাণে আনন্দের শত শত তরঙ্গ উৎফুল্ল হইয়া উঠিবে। তখন তুমি আমাকে তোমার আকাশের কেশদামে আচ্ছাদিত করিয়া বুকের ভিতর টানিয়া লইবে, আর চুম্বনের অগাধ সাগরে আমাকে ডুবাইয়া দিবে।

৯৮। নীরব ভাষা।

মা! সংসারে তো দেখি, যাহারা বড়ই চীৎকারধ্বনিতে তাহাদের আশাভরসার কথা তোমাকে জানায়, তাহাদের আশাভরসা পূর্ণ করিবার জন্য তুমি আগে ছুটিয়া যাও। কিন্তু আমি নীরব অশ্রুপূর্ণ ভাষায় আমার প্রাণের দুঃখবেদনা দিবারাত্রি জানাইতেছি, তাহা নিবারণ করিবার জন্য তো তুমি অগ্রসর হও না? আমি যে নীরব ভাষায় তোমার চরণে আমার আশা-ভরসা দিবানিশি জানাইতেছি, তাহা পূর্ণ করিবার জন্য তো তোমার কোনই আগ্রহ দেখি না? তুমিও তো নীরব ভাষাতেই আমার সঙ্গে কথা কও। আমি তোমার সঙ্গে সর্ব্বক্ষণ থাকিয়া সংসারের সরব ভাষা ভুলিয়া গিয়াছি; তোমারই নীরব ভাষায় তোমার সঙ্গে কথা কহি। এই ভাষাতেই তো আমি আকাশের সঙ্গে বাতাসের সঙ্গে কথা কহিয়া সাড়া পাই; তুমিই বা তবে সাড়া দিবে না কেন? আমাকে কেন পথের এক ধারে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলে? সে আজ অনেক দিনের কথা। এই দীর্ঘকালে আমি পথের পর পথ—কত যে পথ তোমারই সন্ধানে ঘুরিয়াছি তাহা বলিতে পারি না। আমি ভবঘুরে হইয়া পড়িয়াছিলাম; তখন জনপ্রাণী আমার সঙ্গী ছিল না। এখন ভবঘোরা হইতে এই কুটীরে আসিয়া দেখি, তুমিই আমার নিত্যসঙ্গী ছিলে, আর এই কুটীর-দুয়ারেও আমাকে চরণে আশ্রয় দিতেছ। বড়ই আশ্চর্য্য দেখি যে, যেথাকার যত পথ, সকল পথই আমার এই কুঁড়ে ঘরে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এত দূরদূরান্তর ঘুরিয়া আসিয়া দেখি যে, আমার সমস্ত কাজকর্ম্ম, আমার সমস্ত আশাভরসা যেন শেষে তোমার চরণের নিকটে এই কুটীরেই পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে। আমার অশ্রু এখন যেন বিগলিত আনন্দের আকারে অন্তরে দেখা দিতেছে। তোমাকে নিকটে পাইয়া আমার হৃদয় আনন্দে অধীর হইয়া উঠি-তেছে; চারিদিকে সুগন্ধ পুষ্প ফুটিয়া উঠিয়া আমাকে মাতোয়ারা করিয়া তুলিতেছে। তুমি সর্ব্বদাই নিকটে থাক, আর আমায় চরণতলে বসিতে দিও—ইহাই আমার একমাত্র আশা, ইহাই আমার অনন্ত পথের ভরসা ও সম্বল।

৯৯। মেঘের মাঝে আলো।

মা! চারিদিকে ঘন কৃষ্ণবর্ণ মেঘ দেখা দিতেছে। আমার মন আনন্দে নৃত্য করিতেছে। জানি, তুমি ঐ মেঘের বাহনে চড়িয়া কোন্ অতর্কিতে আমার এই ভাঙ্গাচোরা কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইবে। যুগযুগান্তর ধরিয়া তোমার দেখা পাইব আশা করিয়া কত দূরদূরান্তরে ঘুরি-লাম, কত বড় বড় প্রাসাদে প্রবেশ করিলাম; কিন্তু কোথাও তো তোমার দেখা পাইলাম না। যেখানে গেলাম, মনে হইল, ঠিক তাহার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তেই তুমি সেখান হইতে সরিয়া গিয়াছ, পাছে

আমি তোমার দেখা পাই। শেষে যখন আমি নিজেকে সকল হইতে সরাইয়া আনিয়া এই ক্ষুদ্র কুটীরে আসিয়া বসিলাম, তখনই তুমি আমায় ধরা দিতে আসিলে। এখানেও দেখি, চারিদিকে মেঘ যত ঘনাইয়া আসে, তুমিও তত আমাকে তোমার বুকে জাপটাইয়া ধরিয়া আমাকে অভয় দিতে থাক। তখন মনে হয়, মেঘও চিরকাল আমার চারিদিকে ঘনাইয়া আসুক, আর তোমারই কোলে আমি শুইয়া তোমাকে জাপটাইয়া ধরি —আমার ভয় ভাবনা সমস্তই বিদূরিত হউক। মেঘ বড়ই গর্জ্জন করিতেছে—করুক—আমি তোমার কোলে নির্ভয়ে শুইয়া আছি। আমার জীবনের কাজকর্ম্মও আর কিছুই বাকী নাই। যত কিছু কাজকর্ম্ম হাতে লইয়াছিলাম, সমস্তই তো তোমাকে পাইবার প্রত্যাশায়। তাহাই যখন পাইয়াছি, তখন তো আমার কাজ কিছুই বাকী নাই—কাজকর্ম্মের পরপারে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। একটা সরু সুতামাত্র আমাকে এখানে বাঁধিয়া রাখিয়াছে—তোমার যেদিন ইচ্ছা হইবে সেই সূত্রটুকুও কাটিয়া দিও—তখন একেবারে তোমাতে আর আমাতে। আমাদের উভয়ের মিলনপথে, উভয়ের মধ্যে গভীর শান্তির পথে কেহই আসিয়া দাঁড়াইবে না। জননী! তুমিই আমার কাছে থেকো আর আমাকে কাছে রেখো—এখন আমার জীবনতরী তোমার যেথা ইচ্ছা সেথা ভাসিয়া যাক।

১০০। জননী ও সন্তান।

মা! আমি তোমার সন্তান। তুমিই আমার জননী। এই সম্বন্ধটুকু জানাই হইল আমার অনন্ত জীবনের পথের সম্বল। তুমিই মা আমার নয়ন-তারা। পাছে আমার নিমেষ পড়ে, আর তাহারই মধ্যে তুমি অদৃশ্য হইয়া যাও, সেই ভয়ে আমি দিবানিশি নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তোমারই নয়নের দিকে চাহিয়া আছি। আমার দিনেও ঘুম নাই, রাতেও ঘুম নাই। আমার মনপ্রাণ তোমার ঐ চরণের উপরেই পড়িয়া আছে। তোমার চরণ-ধ্বনি আমার বক্ষে নিত্যই বাজে, আমি তাহারই তালে তালে নৃত্য করিতে থাকি। আমাকে তুমি এই পৃথিবীতে যে কাজের ভার দিয়া পাঠাইয়া-ছিলে, এখানকার জীবন তো শেষ হইয়া আসিল, দীর্ঘ অবকাশ লইবার তো সময় আসিয়া পড়িল, কিন্তু তোমার কাজ যে সুচারুরূপে করিতে পারিয়াছি, তাহা কিছুতেই বলিতে পারি না। অনুতাপে প্রাণমন জর্জরিত হইয়া উঠে। সময়ে সময়ে মনে হয়, একখণ্ড পাষাণ লইয়া বক্ষস্থল ভাঙ্গিয়া ফেলি, তোমার চরণে মাথা কুটিয়া বিচূর্ণিত করি। তোমার বিরুদ্ধে যে সমস্ত কাজ করিয়াছি, চিন্তা করিয়াছি, সে সমস্ত যখন ভাবি, তখন আপাদমস্তক অনুতাপের আগুনে দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিতে থাকে। তোমার বিরুদ্ধে গিয়া অবধিই আমার জীবনের সুখশান্তি সমস্তই হারাইয়া বসিয়াছি। এবার যেখানে আমাকে লইয়া যাইবে, দেখো সেখানে যেন আমাকে স্বাধীনতা দিবার অছিলায় তোমার বিরুদ্ধে যাইবার অবসর দিয়ো না। আমায় তোমার কোলেই নিত্য আশ্রয় দিয়া রাখো, এইটুকু ভিক্ষা চাই।

প্রার্থনা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আমাদের উপাসনার একটী ভিত্তি হইতেছে প্রার্থনা। উপাসনার মূল মন্ত্র হইল, ভগবানকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা। এই প্রীতিসাধনের অন্যতর অঙ্গ হইল প্রার্থনা। প্রার্থনা দ্বারা আমরা ভগবানের সহিত যোগযুক্ত হই, তাঁহাকে পিতামাতা ও সখাসুহৃৎ বলিয়া শুধু জানা নহে, কিন্তু উপলব্ধি করিতে পারি। কতকগুলি অক্ষরমূলক মন্ত্র বা শ্লোকাদির বারম্বার আবৃত্তি করার নাম প্রকৃত প্রার্থনা নহে।

সাধারণতঃ আমরা দুঃখবিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য, অথবা আমাদের সুখসৌভাগ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য, আমরা করযোড়ে ঊর্দ্ধনেত্রে বড়ই কাতরকণ্ঠে ডাকি বটে এবং ভাবি যে, আমাদের কাতর ক্রন্দনেরই বলে ভগবান আমাদের প্রার্থনা সফল করিবেন। এরূপ প্রার্থনাও যে, একেবারে নিষ্ফল তাহা আমরা বলি না। ইহারও ফলে স্বল্পমাত্রাতে ভগবানের সহিত উপাসক যোগযুক্ত হন। এইভাবে যিনি ডাকেন, তিনি আসলে দেখিতে পান না, বুঝিতে

পারেন না যে, ভগবান মঙ্গলময়—আমাদের যাহাতে মঙ্গল, তাহাই তিনি বিধান করিবেন।

তাঁহাকে মঙ্গলময় জানিয়া তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছাকে যোগযুক্ত করিয়া তাঁহাকে আত্মস্থ করিবার জন্য যে কাতর প্রার্থনা, তাহাই উপাসনার একটী মুখ্য অঙ্গ। প্রার্থনা যদি সফল করিতে চাও, তবে ভগবানের উপর দৃঢ় আস্থা রাখ, তাঁহার উপর একান্ত নির্ভরশীল হও। কেবল তাঁহার উপর নির্ভরশীল হইলেই চলিবে না, প্রার্থনাকে সফল করিতে চাহিলে আমাদিগকে সত্য-পথের পথিক হইতে হইবে, কারণ ভগবান যে সত্যস্বরূপ। সত্য কথা বলিতে কি, সত্যপথের পথিক হওয়া আর ভগবানের উপর একান্ত নির্ভরশীল হওয়া, আমার মনে হয়, এই উভয় পরস্পরের সহিত বড়ই ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ, একটীকে ছাড়িয়া আর একটী থাকিতে পারে না। সত্যপথের পথিক হইলে আমি কখনই মন্দকর্ম্মের দিকে দৌড়িতে পারিব না—আমাকে শুভকর্ম্মে, আমার নিজের ও জগতের মঙ্গলজনক কর্ম্মেই নিযুক্ত থাকিতে হইবে। তখন আমি যে কর্ম্ম হাতে লইব, সেই কর্ম্মই যে জয়যুক্ত হইবে, সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সংশয় থাকিবে না। এই সংশয়ের অভাবেই তো মানুষ কৃতকার্য্যতার বারো আনা পথ উত্তীর্ণ হইতে পারে।

এই প্রকার নিজের সত্যের উপর এবং নিজের শুভ ও কল্যাণপ্রদ ভাবের উপর অবিচলিত আস্থার এক আশ্চর্য্য চালনীশক্তি আছে; এই আস্থা অন্তরে এমন এক জোয়ার আনিয়া দেয়, যাহার বলে আমাদিগকে উন্নতির পথে, বিজয়ের পথে, ভগবানের সহিত যোগের পথে ঠেলিয়া লইয়া যায়—সেই পথে কাহারও অর্গলস্বরূপে দাঁড়াইয়া গতি রুদ্ধ করা সহজসাধ্য হয় না।

যে মানুষ প্রার্থনা করিতে জানে, তাহাকে অলস নিষ্কর্ম্মা বলিয়া জানিও না। আজকাল বিজ্ঞান সপ্রমাণ করিতেছে যে, যে রশ্মি আমাদের চর্ম্মচক্ষের বাহিরে অদৃশ্য আকারে বর্ত্তমান থাকে, সেই রশ্মিরই কার্য্যকারিতা সমধিক প্রবল। সেইরূপ যে মানুষ প্রকৃত প্রার্থনাশীল, তাঁহার সেই প্রার্থনার ভিতর যে নীরব কর্ম্ম কার্য্য করে, তাহার নিকটে আমাদের হট্টগোলবিশিষ্ট শত সহস্র কর্ম্ম পরাজয় মানিতে বাধ্য হয়। এইজন্য প্রকৃত প্রার্থনাশীল মানবের এক এক ইঙ্গিতে শত সহস্র লোক সহজেই পরিচালিত হয়। এইজন্যই চলিত কথায় বলে—প্রার্থনাশীল মানবের আদেশে পর্ব্বতও বিচলিত হয়। প্রার্থনা দ্বারা মানুষ বিশুদ্ধ হইয়া উঠে, কারণ উহারই সাহায্যে মানুষ "শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্" এর পবিত্র সংস্পর্শ লাভ করে। সেই পবিত্র সংস্পর্শের ফলে আমাদের পাপতাপ মলিনতা যাহা কিছু, সকলই ক্ষণেকের মধ্যে দগ্ধ হইয়া যায়।

পাশ্চাত্য দেশে যে আদিম সভ্যতার উপযুক্ত জড়-প্রবণভাব বড়ই প্রবল, ইহা পথে চলিতে চলিতে যে কোন পথিক বুঝিতে পারে। আর প্রাচ্য ভূখণ্ডে জড়প্রবণ শতবিধ ভাবের মধ্য দিয়াও অধ্যাত্মপ্রবণতা যে অন্তর্নিগূঢ় আকারে প্রবলভাবে বহমান, তাহা বলিতে গেলে একপ্রকার অবিসংবাদীরূপে সর্ব্বসম্মত। পাশ্চাত্য দেশে সাধারণত প্রার্থনা প্রভৃতি অধ্যাত্মবিষয়সকল এই কারণে আধাআধি গৃহীত হয়, প্রাচ্যবাসীরা সেগুলি পুরাপুরি ভাবে গ্রহণ করে। পাশ্চাত্যবাসীদের মধ্যে প্রার্থনা সম্বন্ধে প্রচলিত "প্রার্থনা কর কিন্তু বারুদ শুষ্ক রেখো"—"Pray but keep the powder dry" এই বাক্যটী আমাদের উক্তি বহুল পরিমাণে সমর্থন করে। এখানে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে প্রার্থনার উপর পাশ্চাত্য জনসাধারণের আধাআধি কেন, আসলে কিছু-মাত্র আস্থা নাই। আর আমাদের দেশে বিশ্বামিত্র যে মহাবাণী জলদগম্ভীরস্বরে বলিয়াছিলেন যে, "ধিক্ বলং ক্ষাত্র বলং ব্রহ্মতেজো বলং বলং" পশুবল কিছুই নহে, ব্রহ্মতেজে পূর্ণ যে বল তাহাই প্রকৃত বল—এই মহাবাণীই আজ সহস্র সহস্র যুগ ধরিয়া ভারতবাসীরা অন্তরে অন্তরে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে। এদেশে ভগবানই একমাত্র দুর্ব্বলের বল বলিয়া গৃহীত হন। প্রাচ্যবাসীর মর্ম্মকথা এই যে, প্রার্থনা কর, বারুদের ভাগ্যে যাহাই হোক।

পাশ্চাত্যবাসীদের সঙ্গে প্রাচ্যবাসীরা এই কারণে সমস্ত হৃদয়ের সহিত মিলিতে পারিতেছে না। বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্যবাসী ও প্রাচ্যবাসী উভয়ের পরস্পরের সহিত ব্যবহারের যে প্রকার আদানপ্রদান চলিতেছে, তাহাতে উভয়ের মধ্যে প্রকৃত মিলন সুদূরপরাহত বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। মিলনের যতই চেষ্টা হোক, উভয়ের মধ্যে ঐ ঈসপের কথিত কাংস্যপাত্র ও মৃন্ময়পাত্রের তথাকথিত মিলনের ভাব সর্ব্বদা জাগরূক থাকিলে মুখস্থ মিলনে কাহারও মনে কিছুতেই প্রকৃত মিলনের ভাব আসিতে পারে না। মিলনের পরিবর্ত্তে মারাত্মক সংশয় সর্ব্বদা জাগিতে থাকে। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য উভয় দেশের অধিবাসীগণ যেদিন প্রাণ খুলিয়া মিলনের জন্য ব্যাকুল হইবে, প্রকৃত মিলনের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবে, সেইদিন যে স্বর্গরাজ্য ধরাধামে অবতীর্ণ হইবে এবং সেদিন যে জগতের সর্ব্বত্র প্রকৃত এক আশ্চর্য্য শান্তিবাণী বিঘোষিত হইবে, তাহা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি।

অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র যেমন লৌহভীমকে কপটাচারভিত্তি সর্ব্বনাশকর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিতে গিয়া ভীষণ প্রতিঘাত পাইয়াছিলেন, সেইরূপ যে কোন জাতি অপর জাতিকে স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে মিথ্যাভিত্তি অপ্রকৃত মিলনে আবদ্ধ করিতে যাইলে ভগবানের মঙ্গলবিধানে সেই জাতিই বিনাশসাধক প্রতিঘাত পাইতে বাধ্য হইবে, ইহা নিঃসন্দিগ্ধ সত্যরূপে ধরা যাইতে পারে।

পাশ্চাত্যদিগের প্রার্থনায় এই প্রকার আধাআধি ভাবের দৃষ্টান্ত অনেক দেওয়া যাইতে পারে। আজ কিছুকাল পূর্ব্বে সংবাদপত্রে দেখিয়াছিলাম যে, নিউইয়র্ক সহরের কোন এক সুপ্রসিদ্ধ গির্জ্জায় উপাসকের সংখ্যা কমিয়া যাইতেছিল বলিয়া উপাসনার পরে নৃত্য দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল—লক্ষ্য এই যে, পশুবৃত্তি উদ্দীপনের আনন্দে যদি গির্জ্জাটা "উপাসকমণ্ডলী" (?) দ্বারা পূর্ণ হয়। এই সেদিন সংবাদপত্রে দেখি যে, বিলাতের কোন বড় গির্জ্জাপতি তাঁহার গির্জ্জা "উপাসকমণ্ডলী" (?) দ্বারা পূর্ণ করিবার বেশ একটা নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন—বায়োস্কোপের টিকিট কিনিয়া বিতরণ! এদেশেও ঐ প্রকার ঢংয়ের বাতাস বহিতে সুরু করিয়াছে। অনেকেই বোধ হয় জানেন যে, অন্ততঃ বঙ্গদেশে দুইএকটী সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়াছে, যাহারা নিজেদের দল পুষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে ব্যভিচার প্রভৃতি দুর্নীতিসমূহ অম্লানবদনে সমর্থন করে। ভগবানের মঙ্গলবিধানে এই সকল সম্প্রদায় দাঁড়াইতে পারিবে না, কিন্তু তাহারা সমাজের গাত্রে যে আঁচড় কাটিয়া যাইবে, সুনীতিপক্ষপাতীদিগের পক্ষে সেই আঁচড় উঠাইতে কিছু সময় লাগিবে, বলা বাহুল্য।

ভারতবর্ষকে আমরা যদি বাঁচাইতে চাই, যদি এই যুগসন্ধিক্ষণে মৃতপ্রায় দেশের প্রাণে নবজীবন আনিতে চাই, তবে আমাদিগকে সত্যধর্ম্মের উপর দাঁড়াইতে হইবে, প্রার্থনাশীল হইতে হইবে, ভগবানের ইচ্ছার সঙ্গে আমাদের ইচ্ছার যোগসাধন করিয়া আমাদিগকে জগতের মঙ্গলসাধক ও পবিত্রতাসাধক হইতে হইবে। ভগবান যদি থাকেন এবং তাঁহার শক্তি ও ইচ্ছা যদি অপ্রতিহত হয়, তবে কাহারও সাধ্য নাই যে, সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি, মঙ্গল ও স্বাধীনতালাভের পথে সত্য সত্য কেহ কোন বাধা স্থাপন করিতে পারে।

ভগবানের সঙ্গে একযোগে যুক্ত হও, স্বাধীনতা হইতে তোমাকে কেহই বঞ্চিত করিতে পারিবে না—পারিবে না। ধর্ম্মরাজ্যে 'ফল' অবলম্বিত উপায়সমূহকে পরিশুদ্ধ করিতে পারে না—The end cannot justify the means। এখানে ফলটাও ভাল অর্থাৎ শুভ বা কল্যাণপ্রদ হওয়া চাই এবং তাহা লাভ করিবার উপায়সকলও কল্যাণপ্রদ হওয়া চাই। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা সহজ ও আপাততৃপ্তিদায়ক হইতে পারে; কিন্তু সেই ইচ্ছা সংযত করিয়া ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছার সহিত নিজ ইচ্ছা সংযুক্ত করিয়া অসাধু ব্যবহারকে সাধুতা দ্বারা জয় করিলে, অসত্য ব্যবহারকে সত্যের দ্বারা জয় করিলে যে বল অর্জ্জিত হয়, তাহার শক্তির নিকট সমগ্র জগত নতমস্তক হইয়া পড়ে—সুরলোক হইতে দেবতারাও তাহা অবাকনয়নে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। এই প্রকার বললাভই প্রকৃত প্রার্থনার জলন্ত পরিচয়। যে প্রার্থনার ফলে আমরা শত্রুদিগেরও মঙ্গল প্রার্থনা করিবার শক্তি অন্তরে ধারণ করিব, সেই প্রার্থনাই প্রকৃত প্রার্থনা। অকিঞ্চনগুরু ভগবান আমাদিগের অন্তরে সেই প্রার্থনারই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিন। আমাদের হৃদয়ের সমস্ত মলিনতা, সমস্ত দৈন্য ও দুর্ব্বলতা সেই প্রার্থনার অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া যাক্।

বৌদ্ধ ও জৈনসাহিত্যে 'কৃষ্ণচরিত্র'।

(ডাঃ শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার)

ধর্ম্মবিশ্বাস ও ঐতিহাসিক সত্য, অনেক সময়ে এ দুয়ের মধ্যে ঐক্য রাখা সম্ভবপর হয় না। ইতিহাসের সম্বন্ধ বহির্জগৎ লইয়া কিন্তু ধর্ম্মের অনুভূতি ও প্রসার হয় অন্তর্জ্জগতে, তাই ধর্ম্মসংস্কার ও ঐতিহাসিক সত্য এ উভয়ের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। ঐতিহাসিক বুদ্ধ ও চৈতন্য এবং বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবগণের কল্পিত এই দুয়ের চিত্রের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। অন্যান্য অনেক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের সম্বন্ধেই একথা খাটে।

বুদ্ধ ও চৈতন্যের ন্যায় কৃষ্ণও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ছিলেন এবং ভক্তগণের হস্তে তিনিও অতিপ্রাকৃত মানুষরূপে কল্পিত হইয়াছেন। এই কল্পিত চরিত্রের পশ্চাতে যে ঐতিহাসিক মানুষটী লুকায়িত আছে তাহার অনুসন্ধান করাই ইতিহাসের কার্য্য। চৈতন্য-সম্বন্ধে এই কার্য্য এখনও খুব কঠিন হয় নাই। বুদ্ধদেব চৈতন্যের প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী, সুতরাং তাঁহার প্রকৃত চিত্র উদ্ঘাটন করা আরও দুরূহ। কিন্তু দুরূহ হইলেও এ সম্বন্ধে অনেক চেষ্টা হইয়াছে এবং কিছু কিছু ফললাভও হইয়াছে। কৃষ্ণ বুদ্ধদেবেরও পূর্ব্ববর্ত্তী, সুতরাং তাঁহার জীবনের প্রকৃত তথ্য উদ্ধার করা আরও কষ্টকর। কৃষ্ণ-বাসুদেব যে বুদ্ধ ও চৈতন্যের ন্যায় একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি এই সম্বন্ধেই কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও পণ্ডিতগণের মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, অনেকের মনে এখনও হয় তো আছে। কিন্তু অনেক ঐতিহাসিকই এখন স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, কৃষ্ণ অথবা

বাসুদেব নামে সত্য-সত্যই একজন ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন। ছান্দোগ্যোপনিষদে ঘোর আঙ্গিরসের শিষ্য দেবকীপুত্র কৃষ্ণের উল্লেখ আছে। এই দেবকীপুত্র কৃষ্ণই যে পরবর্ত্তীকালে বৈষ্ণবগণের উপাস্য দেবতারূপে কল্পিত হইয়াছেন এই সিদ্ধান্ত অনেকেই সমীচীন বলিয়া মনে করেন। বুদ্ধদেবের ন্যায় কৃষ্ণ-বাসুদেবও কালক্রমে ভক্তগণের ঈশ্বররূপে পরিগণিত হইয়াছেন, ইহাতে আশ্চর্য্য বোধ করিবার কিছুই নাই। (১)

পুরাণ, মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থে কৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে এবং তাঁহার সম্বন্ধে অনেক অপ্রাকৃত ও অলৌকিক কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই সমুদয় কাহিনীর মধ্য হইতে কৃষ্ণের যথার্থ জীবনচরিত সংগ্রহ করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় যাঁহারা কৃষ্ণের ভক্ত বা উপাসক নহেন তাঁহাদের গ্রন্থেও এই ঐতিহাসিক চরিত্রের উল্লেখ আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বৌদ্ধ ও জৈন-গ্রন্থের উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন্য ধর্ম্মগ্রন্থসমূহে কৃষ্ণ-সম্বন্ধে অনেক আলোচনা আছে। অবশ্য এগুলিও গল্প, কিন্তু ইহাতে কৃষ্ণ মানুষরূপেই কল্পিত হইয়াছেন। ভক্তগণের মানসপ্রসূত অতিরঞ্জিত চিত্রের সহিত এইগুলির তুলনা করিলে ঐতিহাসিক কৃষ্ণের সম্বন্ধে কিছু জ্ঞানলাভ করা যাইতে পারে। এই বিষয়ে সম্যক্ আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সম্ভব নহে। কেবল বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মসাহিত্যে কৃষ্ণ কিরূপভাবে অঙ্কিত হইয়াছেন মাত্র তাহারই কিছু নিদর্শন দিতে চেষ্টা করিব। বৌদ্ধ "ঘতজাতকে" নিম্নলিখিত আখ্যানটী আছে।

অতীতকালে উত্তরাপথে কংসরাজ্যে (২) অসৃতঞ্জন নগরে মহাকংস নামক রাজা রাজত্ব করিতেন। কংস ও উপকংস নামে দুই পুত্র ও দেবগর্ভা (দেবগর্ত্তা) নামে তাঁহার এক কন্যা জন্মিয়াছিল। এই কন্যার জন্মদিবসে নৈমিত্তিক ব্রাহ্মণগণ বলিয়াছিলেন যে, ইহার গর্ভে উৎপন্ন পুত্র কংসরাজ্য (৩) ও কংসবংশ বিনাশ করিবে। রাজা মহাকংস অপত্যস্নেহপ্রযুক্ত কন্যার প্রাণবধ করিতে পারিলেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর কংস রাজা ও উপকংস উপরাজা হইলেন। ভগিনীর প্রাণনাশ করিলে লোকনিন্দা হইবে এই বিবেচনায় তাঁহারা ইহাকে বিবাহ না দিয়া একস্তম্ভযুক্ত (১) প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে বন্দী করিয়া রাখিলেন। নন্দগোপা নামে দেব-গর্ভার এক পরিচারিকা ছিল। তাহার স্বামী অন্ধক-বৃষ্ণি (? অন্ধকবেণ্‌হু) দেবগর্ভার রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

তৎকালে উত্তর মথুরায় (মধুরা) মহাসাগর নামক রাজা ছিলেন। তাঁহার সাগর ও উপসাগর নামক দুই পুত্র, তাঁহার মৃত্যুর পর যথাক্রমে রাজা ও উপরাজা হইয়াছিলেন। উপসাগর ভ্রাতার অন্তঃপুরে দুষ্কার্য্যের অপরাধে ধৃত হইয়া সহাধ্যায়ী ও বাল্যসুহৃৎ উপকংসের নিকট পলায়ন করিলেন। উপকংসের অনুরোধে রাজা কংস তাঁহাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিলেন। ক্রমে উপসাগর দেবগর্ভার বিবরণ অবগত হইয়া তাঁহার প্রতি আসক্ত হইলেন, দেবগর্ভাও তাঁহাকে দর্শন করিয়া ও নন্দগোপার নিকট তাঁহার পরিচয় অবগত হইয়া তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইলেন। ক্রমে নন্দগোপার সাহায্যে নিশাযোগে দেবগর্ভার গৃহে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল এবং এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে দেবগর্ভার গর্ভ-লক্ষণ প্রকাশ পাইল। তখন কংস ও উপকংস দুই ভ্রাতা নন্দগোপাকে অভয়দানপূর্ব্বক তাহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উপসাগরের সহিত দেবগর্ভার বিবাহ দিলেন। মনে মনে স্থির করিলেন যে যদি দেব-গর্ভার কন্যাসন্তান হয় তাহা হইলে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যদি পুত্রসন্তান হয় তাহা হইলে অবিলম্বে তাহার প্রাণনাশ করিবেন।

যথাকালে দেবগর্ভা একটী কন্যাসন্তান প্রসব করি-লেন। কংস ও উপকংস ইহা শুনিয়া অতিশয় তুষ্ট হইলেন এবং নবজাত কন্যার 'অঞ্জনাদেবী' এই নামকরণ করিলেন। গোবর্দ্ধমান (গোবড্‌ঢমান) নামক গ্রাম তাঁহারা ভগিনীকে প্রদান করিলেন এবং উপসাগর ও দেবগর্ভা অতঃপর তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

কালক্রমে একই দিনে দেবগর্ভা ও নন্দগোপার

(১) কৃষ্ণ যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ Sir R. G. Bhandarkar প্রণীত Vaishnavism, Saivism and Minor Religious System এবং Dr. H. C. Roy Choudhury প্রণীত Early History of Vaishnavism দ্রষ্টব্য।

(২) মূলের কংসভোগ শব্দটী ইংরেজী অনুবাদক Kamsa District এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন। কংস শব্দ কোন ভূভাগ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইত এরূপ প্রমাণ পাই নাই।

(৩) এখানেও মূলে আছে 'কংসভোগ' কিন্তু 'কংসগোত্ত' অর্থাৎ 'কংসগোত্র' এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

(১) ইংরেজী অনুবাদক মূলের "একথূণকং পাসাদং" এই শব্দদ্বয়ের 'a single round-tower' এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু পালি 'থূণা' (সংস্কৃত—স্থূণা) শব্দের অর্থ স্তম্ভ। পালি মহাবংশে 'একথূণিকং গেহং' এই পদের "an apartment built on a single pillar" Childers এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন (Childer's Pali Dictionary, p. 505)। একস্তম্ভযুক্ত প্রাসাদটী ঠিক কি রকম বুঝিতে পারা যায় না। প্রাচীন ভারতের স্থপতিবিদ্যা-বিষয়ে যাঁহারা আলোচনা করেন, তাঁহারা এই বিষয়টী বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারেন।

গর্ভসঞ্চার হইল এবং একদিনেই দেবগর্ভা একটী পুত্র ও নন্দগোপা একটী কন্যাসন্তান প্রসব করিলেন। দেবগর্ভা পুত্রের প্রাণনাশভয়ে ভীতা হইয়া গোপনে স্বীয় সন্তান নন্দগোপার নিকট প্রেরণ করিলেন এবং নন্দগোপার কন্যা নিজের নিকট আনাইয়া রাখিলেন। তাঁহার ভ্রাতারাও ভগিনীর কন্যাসন্তান প্রসব হইয়াছে শুনিয়া তাঁহাকে যথাবিধি লালন-পালনের ব্যবস্থা করিলেন। এইরূপে ক্রমে দেবগর্ভার দশ পুত্র ও নন্দগোপার দশ কন্যা জন্মিল। পুত্রগণ নন্দগোপার নিকট ও কন্যাগণ দেবগর্ভার নিকট পালিত হইল; কেহই কিছু জানিতে পারিল না। দেবগর্ভার জ্যেষ্ঠপুত্র বাসুদেব, দ্বিতীয় পুত্র বলদেব এবং অবশিষ্ট পুত্রগণ যথাক্রমে চন্দ্রদেব (চন্দদেব), সূর্য্যদেব (সুরিয়দেব), অগ্নিদেব (অগ্‌গিদেব), বরুণদেব, অর্জ্জুন (অজ্জুন), প্রদ্যুম্ন (১) (? পজ্জুন) ঘৃতপণ্ডিত (ঘতপণ্ডিত) ও অঙ্কুর নামে অভিহিত হইল।

'অন্ধকবৃষ্ণিদাস-পুত্র' নামে পরিচিত এই ভ্রাতৃগণ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত বলশালী ও দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিল। তাহারা পরস্বাপহরণ, এমন-কি রাজদ্রব্য পর্য্যন্ত লুঠ করিতে আরম্ভ করিল। প্রজাগণ রাজার নিকট অভিযোগ আনয়ন করিলে রাজা অন্ধকবৃষ্ণিকে ডাকাইয়া পুত্রগণের দুর্ব্বিনীত আচরণের নিমিত্ত তাহাকে অনেক তর্জ্জন-গর্জ্জন করিলেন। ভীত হইয়া অন্ধকবৃষ্ণি রাজ-সমীপে যথাযথ নিবেদন করিল। রাজা কংস, ইহারা তাহার ভগিনীপুত্র, এই গূঢ় রহস্য বিদিত হইয়া কি উপায়ে ইহাদের বিনাশ-সাধন করা যায়, অমাত্যবর্গের সহিত তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। অমাত্যবর্গ বলিলেন, "ইহারা মল্লযুদ্ধকারী, নগর-মধ্যে মল্লযুদ্ধ হইবে এইরূপ ঘোষণা করা যাউক, তৎপর ইহারা যুদ্ধমণ্ডপে উপস্থিত হইলে ইহাদের বিনাশ করা যাইবে।" তদনুসারে রাজা চাণুর ও মুষ্টিক (মুট্‌ঠিক) নামক মল্লদ্বয়কে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন এবং ভেরীবাদন দ্বারা সপ্তম দিবসে রাজদ্বারে মল্লযুদ্ধ হইবে এইরূপ ঘোষণা করিয়া দিলেন।

যথাসময়ে চাণুর ও মুষ্টিক রঙ্গস্থলে আসিয়া তর্জ্জন-গর্জ্জন আরম্ভ করিল। অন্ধকবৃষ্ণির দশ পুত্রও পল্লিমধ্যে রজকবীথি লুণ্ঠন করিয়া দিব্য বিচিত্র বস্ত্র এবং গন্ধবণিক্ ও মালাকরের নিকট হইতে গন্ধ ও মাল্য গ্রহণ করিয়া সুশোভিত ও সুগন্ধযুক্ত হইয়া যুদ্ধমণ্ডপ প্রবেশ করিলেন।

প্রথমে বলদেব চাণুর ও মুষ্টিককে হত্যা করিলেন। (১) মুষ্টিক মৃত্যুকালে প্রার্থনা করিল যেন যক্ষ হইয়া বলদেবকে গ্রাস করিতে পারে, তদনুসারে কালমত্তির নামক অরণ্যে সে যক্ষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। অতঃপর বাসুদেব চক্রক্ষেপণ করিয়া কংস ও উপকংস দুই ভ্রাতার শিরশ্ছেদন করিলেন। ভীত ত্রস্ত অধিবাসীগণ তাঁহাদের বশ্যতা স্বীকার করিলে তাঁহারা অসিতাঞ্জন নগরে রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন ও মাতাপিতাকে তথায় আনাইলেন। তৎপর সমগ্র ভারতবর্ষ জয়ের উদ্দেশে বহির্গত হইয়া কালসেন রাজার রাজধানী অযোধ্যানগরী অধিকার করিয়া তাঁহার রাজ্য হস্তগত করিলেন। অনন্তর তাঁহারা দ্বারাবতী জয়ের উদ্দেশে নির্গত হইলেন। দ্বারাবতী নগরীর একদিকে সমুদ্র একদিকে পর্ব্বত। শত্রু উপস্থিত হইলেই ইহার রক্ষক যক্ষ গর্দ্দভরবে চীৎকার করিতে থাকে এবং তৎক্ষণাৎ সমগ্র নগরী উৎপতিত হইয়া সমুদ্র মধ্যে এক দ্বীপে অবস্থান করে। পরে শত্রু পশ্চাৎপদ হইলে পুনরায় স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করে। বাসুদেব ও তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ দ্বারাবতীগ্রহণে অসমর্থ হইয়া কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের শরণাপন্ন হইলেন। পরে তাঁহার পরামর্শ অনুসরণ করিয়া দ্বারাবতী রাজ্য অধিকার করিলেন। ক্রমে তাঁহারা চক্রদ্বারা ত্রিষষ্টিসহস্র রাজার প্রাণবধ করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে স্বীয় অধিকার স্থাপনপূর্ব্বক দ্বারাবতীতে অধিষ্ঠিত হইলেন। সমগ্র রাজ্য দশভাগে বিভক্ত হইল। সর্ব্বকনিষ্ঠ অঙ্কুর বাণিজ্যে লিপ্ত হইলেন। অবশিষ্ট নয় ভ্রাতা ও তাহাদের ভগিনী অঞ্জনাদেবী এক-একটী রাজ্য গ্রহণ করিলেন এবং দ্বারাবতীতে বসবাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা পুত্রকন্যা-সমভিব্যাহারে বহুবর্ষ রাজত্ব করিলেন। তৎকালে মনুষ্যের আয়ুঃ-পরিমাণ বিংশসহস্র বর্ষকাল ছিল।

কালক্রমে বাসুদেবের এক পুত্র অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলে বাসুদেব শোকে উন্মত্ত হইলেন এবং সর্ব্বকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল মৃতপুত্রের জন্য বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে শান্ত করিবার নিমিত্ত ঘৃতপণ্ডিত এক অভিনব উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি উন্মত্তের ন্যায় আকাশের দিকে চাহিয়া 'আমাকে একটী শশক দাও, আমাকে একটী শশক দাও' এই বলিয়া দ্বারাবতীর পথে পথে বেড়াইতে লাগিলেন। রোহিণেয় নামক অমাত্য বাসুদেবের নিকট

(১) 'পজ্জুন' সংস্কৃত প্রদ্যুম্ন ও পর্জ্জন্য এ উভয়েরই রূপান্তর হওয়া সম্ভব। (English Translation of the Jatakas, Vol, IV. p. 51 fn 1)

(১) জাতক, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৭২

এই সংবাদ নিবেদন করিয়া বলিলেন, "কৃষ্ণ শীঘ্র উঠ, হে কেশব তুমি এখানে বিলাপ করিতেছ আর তোমার ভ্রাতা উন্মত্ত হইয়া ঘুরিতেছে।" ইহা শুনিয়া কেশব ঘৃতপণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "তুমি কিরূপ শশক চাও বল, মণি-মুক্তা, স্বর্ণ-রৌপ্য-লৌহ, শঙ্খ শিলা অথবা প্রবাল-নির্ম্মিত যেরূপ শশক চাও আমি তাহাই আনিয়া দিতেছি।" ঘৃতপণ্ডিত বলিলেন, 'আমি এ সকল কিছুই চাই না, কেবল চন্দ্রের কোলে যে শশক আছে আমাকে তাহাই আনিয়া দাও।' রাজা বাসুদেব ভ্রাতার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে ইহা নিঃসংশয়ে স্থির করিয়া বলিলেন, "ভ্রাতঃ তুমি নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, কারণ তুমি অপ্রার্থনীয় বস্তুর প্রার্থনা করিতেছ।" ইহা শুনিয়া ঘৃতপণ্ডিত বলিলেন, "হে কৃষ্ণ যদি তুমি ইহা জান, তবে মৃতপুত্রের নিমিত্ত শোক করিতেছ কেন?" এই কথা শুনিয়া বাসুদেব পুত্রশোক পরিহার করিলেন।

বাসুদেব বহুকাল রাজ্যশাসন করিলে একদা তাঁহার পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণ পরামর্শ করিলেন, "ঋষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন দিব্যচক্ষুঃসম্পন্ন কি না আমরা ইহার পরীক্ষা করিব।" একটী বালকের উদরে একটী বালিশ বাঁধিয়া তাহারা কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নকে জিজ্ঞাসা করিল "তাপস, এই কুমারী কি প্রসব করিবে?" মুনি দিব্যচক্ষুতে সমুদয় অবগত হইয়া বলিলেন, "অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে ইহার খদিরকাষ্ঠ প্রসব হইবে। উহা দগ্ধ করিয়া ভস্মরাশি নদীজলে নিক্ষেপ করিলেও তদ্দ্বারা বাসুদেবকুল বিনষ্ট হইবে।" তখন বালকগণ তপস্বীকে ভণ্ড বিবেচনা করিয়া তাঁহার প্রাণসংহার করিল। রাজগণ সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিয়া ভীত হইলেন। সপ্তম দিবসে উক্ত কুমারের কুক্ষি হইতে খদিরকাষ্ঠ নির্গত হইলে তাহা ভস্ম করিয়া নদীজলে ভাসাইয়া দিলেন। কিয়দ্দূর নদী-পার্শ্বে লাগিয়া ভস্মরাশি একটা এরক বৃক্ষে পরিণত হইল।

অনন্তর একদিন রাজগণ ও রাজকুমারগণ জলকেলি উপলক্ষে ঐস্থানে গমন করিয়া কলহে রত হইলেন। মুষল অভাবে তাহারা এরক বৃক্ষের পত্র লইয়া পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিল। ঐ পত্র মুষল আকারে পরিণত হইয়া পরস্পরের বিনাশ করিতে লাগিল। বাসুদেব, বলদেব, অঞ্জনা দেবী ও তাহাদের পুরোহিত রথে চড়িয়া পলায়ন করিলেন। আর সকলে ঐ স্থানে বিনষ্ট হইলেন। পথিমধ্যে কালমত্তিয়-বনে মল্ল মুষ্টিক স্বীয় প্রার্থনা অনুসারে যক্ষযোনিরূপে বাস করিতেছিল; বলদেব তাহার হস্তে নিহত হইলেন। বাসুদেব বনমধ্যে বিশ্রাম করিতেছিলেন, এমন সময়ে জরানামক ব্যাধ শূকরভ্রমে তাঁহাকে বধ করিল। এইরূপে অঞ্জনা ব্যতীত সকলেই বিনষ্ট হইলেন।

অন্যান্য বৌদ্ধজাতকেও কৃষ্ণ-বাসুদেবের উল্লেখ আছে। কুম্ভজাতকেও সুরাপানের দোষ-বর্ণনা-প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত গাথাটী উদ্ধৃত হইয়াছে—(১)

"এই সুরাপান করিয়াই অন্ধকবৃষ্ণি-পুত্রগণ (অন্ধক-বেন্‌হু পুত্তা) সমুদ্রতীরে পরিভ্রমণ করিতে করিতে মুষলদ্বারা পরস্পরকে আক্রমণ করিয়াছিল।"

সংকিচ্চ জাতকে সাধু ব্যক্তির প্রতি অসদাচরণ করিলে কি বিষময় পরিণাম ঘটে তাহার বর্ণনা প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত গাথাটী উদ্ধৃত হইয়াছে—(২)

"ঋষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নকে আক্রমণের ফলে অন্ধকবৃষ্ণি-গণ (অন্ধক বেন্‌হুয়ো) পরস্পরের মুষলের আঘাতে যমালয়ে গমন করিয়াছিল।"

জৈন উত্তরাধ্যয়ন-সূত্রে কৃষ্ণ-বাসুদেব সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গল্প আছে।

"শৌর্য্যপুর নামক নগরে বাসুদেব নামে এক পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তাঁহার দুই স্ত্রী, রোহিণী ও দেবকী। রোহিণীর পুত্র রাম, দেবকীর পুত্র কেশব। শৌর্য্যপুরে আর একজন রাজা ছিলেন তাঁহার নাম সমুদ্রবিজয়, তাঁহার স্ত্রী শিবার গর্ভে অরিষ্টনেমি নামে তাঁহার এক পুত্র হয়।

"কেশব রাজীমতীর নামে এক রাজকন্যার সহিত অরিষ্টনেমির বিবাহ স্থির করিলেন। বৃষ্ণিবংশীয় কুমার অরিষ্টনেমি সৈন্য-সামন্ত-পরিবৃত হইয়া উপযুক্ত সমারোহ-সহকারে বিবাহ করিতে চলিলেন। পথিমধ্যে তিনি দেখিলেন কতকগুলি পশুবধের আয়োজন হইতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে তাঁহারই বিবাহের ভোজ উপলক্ষে এই সমুদয় পশুবধ করা হইবে। ইহা শুনিয়া তাঁহার মনে গভীর দুঃখ উপস্থিত হইল। তিনি সংসার ত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া দ্বারকাপুরী ত্যাগ করিয়া রৈবতক পর্ব্বতে গমন করিলেন। রাম ও কেশব অরিষ্ট-নেমির সহিত রৈবতকে সাক্ষাৎ করিয়া দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিলেন।"

এই গল্পের শৌর্য্যপুর, সম্ভবতঃ 'মথুরা'। কৃষ্ণের এক নাম শৌরি, সম্ভবতঃ ইহা হইতেই শৌর্য্যপুরের উৎপত্তি। কিন্তু অরিষ্টনেমির বিবাহ প্রভৃতি ঘটনা দ্বারকাতেই হইয়াছিল।

'অন্তগড় দসাও' নামক আর একখানি জৈন ধর্ম্মগ্রন্থে কৃষ্ণের অনেক কথা লিপিবদ্ধ আছে। প্রধান প্রধান অংশগুলি নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল। (১) "দ্বারাবতী নগরীতে বাসুদেব রাজত্ব করিতেন, তাঁহার এক নাম

(১) জাতক, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১৮

(২) জাতক, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ২৬৭

ছিল কৃষ্ণ। দশার-বংশীয় সমুদ্রবিজয়, বলদেব, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, মহাসেন, বীরসেন, উগ্রসেন প্রভৃতি তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিত। এতদ্ব্যতীত তাঁহার রুক্মিণী প্রভৃতি ষোড়শ সহস্র রাণী এবং অনঙ্গসেনা-প্রমুখ বহু সহস্র বারবণিতা ছিল।"

(২) দ্বারাবতী নগরীতে বসুদেব নামে রাজা ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম দেবকী। একদিন মহাত্মা অরিষ্টনেমি দ্বারাবতীতে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার ছয়জন শিষ্য দেবকীর নিকট ভিক্ষার জন্য গমন করিল। দেবকী এই শিষ্যগণের কান্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং পরিচয় লইয়া জানিলেন যে ইহারা ছয় ভাই। তাঁহাদের পিতার নাম 'নাগ', মাতার নাম সুলসা এবং তাঁহাদের জন্মস্থান ভদ্দিলপুর। তাহারা চলিয়া গেলে দেবকী মনে মনে ভাবিলেন "বাল্যকালে এক সাধু আমার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে আমার এমন আটটী পুত্র হইবে যে, তাহাদের তুল্য ভারতবর্ষে আর দেখা যাইবে না। এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হওয়ার কোন লক্ষণ দেখিতেছি না—সুতরাং মহাত্মা অরিষ্টনেমিকে এই বিষয় নিবেদন করিব।" অতঃপর দেবকী অরিষ্টনেমির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অরিষ্টনেমি দেবকীকে বলিলেন—"ভদ্দিলপুরে নাগ নামক এক ব্যক্তির সুলসা নামে স্ত্রী ছিল। তাহার বাল্যকালে এক জ্যোতির্ব্বিদ গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে সে মৃতবৎসা হইবে। সুলসা ভক্তি-সহকারে 'হরিণেগমেসী' নামক দেবের পূজা করিল। ফলে তুমি ও সুলসা একই কালে সন্তান প্রসব করিলে, কিন্তু হরিণেগমেসী সুলসার মৃতপুত্রগুলি তোমার নিকট রাখিয়া তোমার পুত্রদিগকে সুলসার নিকট রাখিত। প্রকৃতপক্ষে সুলসার পুত্র নামে পরিচিত অরিষ্টনেমির ছয় শিষ্য তোমারই সন্তান।" তখন দেবকী মনে মনে ভাবিলেন—"হায় আমি নলকুবেরের ন্যায় সাতটী পুত্রসন্তান গর্ভে ধারণ করিলাম, কিন্তু একটাকেও শিশু-অবস্থায় পালন করিতে পারিলাম না। কেবলমাত্র পুত্র কৃষ্ণ-বাসুদেব ছয়মাস অন্তর একবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে।" অতঃপর দেবকী কৃষ্ণের নিকট নিজের দুঃখের কথা বলিলেন। তখন কৃষ্ণ হরিণেগমেসী দেবকে স্তবে তুষ্ট করিয়া তাঁহার এক কনিষ্ঠ পুত্র জন্মিবে এই বর লাভ করিলেন। ক্রমে দেবকীর এক পুত্র হইল—তাহার নাম হইল "গয়-সুকুমাল।" গয়-সুকুমাল বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সংসার ত্যাগ করিয়া অরিষ্টনেমির নিকট দীক্ষালাভ করিল।

(৩) একদিন কৃষ্ণ অরিষ্টনেমিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি প্রকারে দ্বারাবতী নগরীর ধ্বংস হইবে?" অরিষ্টনেমি বলিলেন, "জল অগ্নি ও দ্বৈপায়ন ইহার ধ্বংসের কারণ হইবে।" এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণ ভাবিলেন তাঁহার বংশের অনিরুদ্ধ, শাম্ব, প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি যাহারা সংসার ত্যাগ করিয়া গিয়াছে তাহারাই সুখী আর তিনি রাজ্যের দায়িত্ব বহন করায় সংসার ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। অরিষ্টনেমি তাহার মনের গোপন চিন্তা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "কৃষ্ণ তাহা হইবার নয়, বাসুদেব মাত্রেই পূর্ব্বজন্মে দুষ্কৃত করিয়াছে, সুতরাং তাহারা এজন্মে সন্ন্যাস লইতে পারিবে না।"

তখন কৃষ্ণ অরিষ্টনেমিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমার মৃত্যুর পর আমি কোথায় জন্মগ্রহণ করিব?" অরিষ্টনেমি বলিলেন, "তোমার মাতাপিতার আহ্বানে তুমি এই স্থান ত্যাগ করিবার পর, প্রবল জলস্রোত, অগ্নি ও দ্বৈপায়নের ক্রোধ দ্বারাবতী ধ্বংসের কারণ হইবে। রাম ও বলদেবের সহিত তুমি দক্ষিণসমুদ্রের দিকে "পাণ্ডু মহুরায় পাণ্ডু রাজার পুত্র" যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডবের নিকট যাত্রা করিবে। কোশম্ব-বনে বৃহৎ ন্যগ্রোধ-বৃক্ষের নিম্নে পীতবাসধারী তোমার বাম পায়ে জরাকুমারের বাণ লাগিয়া তোমার মৃত্যু হইবে। মৃত্যুর পর তুমি নরকে যাইবে।" এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণ অত্যন্ত বিমর্ষ হইলেন। তখন অরিষ্টনেমি বলিলেন, "তুমি দুঃখিত হইও না। নরকভোগের পর এই ভারতবর্ষেই পৌণ্ড্রদেশে তোমার জন্ম হইবে এবং তুমি মোক্ষলাভ করিবে।" অতঃপর কৃষ্ণের পত্নী পদ্মাবতী, গৌরী, সত্যভামা, রুক্মিণী, জাম্বুবতী প্রভৃতি অরিষ্টনেমির নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়া ভিক্ষুণীর জীবন-যাপন করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে মোক্ষলাভ করিলেন।

কৃষ্ণ-সম্বন্ধে জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থে আর যে সমুদয় আখ্যান আছে বাহুল্যভয়ে তাহার উল্লেখ করিলাম না। যে কয়েকটী আখ্যান উল্লিখিত হইয়াছে তাহার সম্যক্ আলোচনা ও বিশ্লেষণ করাও বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কৃষ্ণের জন্মের ও জীবনের মুগবিবরণ পুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতিতে যেরূপ পাওয়া যায় তাহার সহিত উক্ত আখ্যানগুলির প্রভেদও যেমন আছে সামঞ্জস্যও তেমনি। যশোদার সহিত সন্তানবিনিময়, কংসের আখ্যান, দ্বারকায় রাজ্যস্থাপন, পাণ্ডবগণের সহিত সখ্য, দ্বারকার ধ্বংস ও অপঘাতমৃত্যু প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ে একটা ঐক্য এই সকল গল্পের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। এই সমুদয় বিভিন্ন উপাদানের তুলনা-মূলক আলোচনা দ্বারাই কৃষ্ণ-চরিত্রের ঐতিহাসিক ভিত্তি গড়িতে হইবে। পুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতিতে কৃষ্ণের চরিত্র যেরূপ অঙ্কিত

হইয়াছে, ললিতবিস্তর প্রভৃতি গ্রন্থেও বুদ্ধের চিত্র সেইরূপ—তথাপি বুদ্ধের ঐতিহাসিক কাহিনী কতক পরিমাণে উদ্ধার করা সম্ভবপর হইয়াছে। অনুরূপ প্রণালীর অনুসরণ করিয়া উল্লিখিত উপাদানের সাহায্যে কৃষ্ণ-চরিত্রের ঐতিহাসিক ভিত্তি গঠিত হইতে পারিবে এরূপ আশা করা যায়।*

ভারতীয় সঙ্গীতের অধ্যাত্মভাব।

(ডাঃ শ্রীবাণী দেবী সঙ্গীতভারতী)

অতি অল্প লোকই ভারতীয় সঙ্গীতের তত্ত্ব, বিশেষত উহার ঐতিহাসিক দিক লইয়া নাড়াচাড়া করেন। যাঁহারা আপনাদিগকে সঙ্গীতজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দিতে সমুৎসুক, তাঁহাদের অধিকাংশই উহার practical দিক বা যন্ত্রাদির সাহায্যে বাজাইবার ও গাহিবার দিক আলোচনা করিতেই ভালবাসেন। আমরা ভারতীয় সঙ্গীত উপলক্ষে উপরোক্ত কথা বলিয়া আসিলাম বটে, কিন্তু ইহা সকল দেশের ও সকল জাতির সঙ্গীতজ্ঞদিগের সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, সর্ব্বদেশীয় ও সর্ব্বজাতীয় সঙ্গীতের মধ্যে একটি অসাম্প্রদায়িক সার্ব্বজনীন প্রাণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা বলা বাহুল্য যে, সকল দেশের, সকল জাতির ও সকল কালের সঙ্গীতের মধ্যে সকল গণ্ডীর বহির্ভূত সর্ব্ববিধ সীমার অতীত এক একতত্ত্বকে অক্ষুণ্ণপ্রভাবে বিরাজমান থাকিতে দেখা যায়। তাহার নিকটে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বলিয়া, অতীত ও ভবিষ্যৎ বলিয়া কোন প্রকার ভেদাভেদ দাঁড়াইতে পারে না। ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ এই সত্য সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া সঙ্গীতকে অনাদ্যনন্ত ব্রহ্ম হইতে বিনিঃসৃত এক অনন্ত শব্দলহরী বুঝাইবার জন্য উহাকে "নাদব্রহ্ম"রূপে বিঘোষিত করিয়াছেন।

ইহা সর্ব্বজনবিদিত যে কি সাহিত্য কি কলাবিদ্যা, কি দর্শন কি বিজ্ঞান, সকল বিভাগেই জগতের জ্ঞানবৃদ্ধিসাধনে ভারতবর্ষ প্রচুর পরিমাণে বহুমূল্য রত্নরাজি দান করিয়াছেন। পাশ্চাত্যবাসীগণ সর্ব্বপ্রথম এদেশে যখন পদার্পণ করেন, তাঁহারা স্বভাবতই ভারতের অন্তর্নিহিত রত্নরাজির কোনই সন্ধান পান নাই। তাঁহারা উহার বহির্দ্দেশে মাত্রই বিচরণ করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন; কাজেই ভারতভূমির নিকট বিশ্বজগৎ যে অপূর্ব্ব দান প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার মূল্য তাঁহারা কিছু মাত্র বুঝিতে পারেন নাই। ইহার কারণে তাঁহারা ভারতবাসীকে অর্দ্ধ অসভ্য ভাবিয়া মনে করিতেন যে, উহাদের বিজ্ঞান বা দর্শন, সাহিত্য বা শিল্প কিছুই নাই। অবশেষে যখন জার্ম্মনীদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের প্রাণপণ পরিশ্রমের ফলে এবং সার উইলিয়াম জোন্স, H. H. Wilson প্রভৃতি কতিপয় উদারহৃদয় ইংরাজমনীষীগণের প্রশংসনীয় অধ্যবসায় ও উদ্যমের ফলে সেই সকল রত্নভাণ্ডারের দ্বার সর্ব্বসমক্ষে উন্মুক্ত হইয়া গেল, তখন পাশ্চাত্যবাসীদিগের দৃষ্টি ঐ সকল রত্নসমূহ হইতে বিনিঃসৃত আলোকের ঝরণার ক্ষণেকের জন্য ঝলসিয়া গেল।

জগতের শিক্ষাদীক্ষার উন্নতিসাধনে ভারতবর্ষ যে সকল বিষয় দান করিয়াছে, তন্মধ্যে বোধ হয় সঙ্গীত অগ্রণীর উপযুক্ত সম্মুখস্থ আসন পাইবার অধিকারী। বিশ্বজগত জুড়িয়া সঙ্গীতকে ধর্ম্মের সহচর বলিয়া সাধারণত ধরা হয়। একথা ভারতবর্ষের পক্ষে অধিকতর প্রযুক্ত হইতে পারে, বলা বাহুল্য। ইহা জানা কথা যে, অধ্যাত্মভাব ধর্ম্মমাত্রেরই মূল উৎস। সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক মোক্ষমূলার ঠিকই বলিয়াছেন যে, ভারতের প্রকৃতি ও নানা অবস্থার কারণে অধ্যাত্মভাব এদেশে যেমন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, এমন আর কোন দেশে হয় নাই। এই অধ্যাত্মভাবের প্রবণতা ভারতীয় সঙ্গীতে বিশেষভাবে আধ্যাত্মিকতার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। উহা রাগরাগিণীর ভিতর দিয়া সাধারণতঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

রাগরাগিণী যদিও ভারতীয় সঙ্গীতে সমধিক উন্নত আকারে প্রকাশ পায়, তথাপি আমরা ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, বিশ্বজগতেরই সঙ্গীতে, যতই কেন অনুন্নত আকারে হউক না উহার অস্তিত্ব দেখা যায়।

ভারতের ঋষিরা সঙ্গীতকে এই অসার সংসারের উপরে উঠিবার এবং ভগবানের সিংহাসনতলে পৌছিবার অনন্যশ্রেষ্ঠ উপায়স্বরূপে দৃষ্টি করিতেন। "গানাৎ পরতরং নহি" অর্থাৎ গান অপেক্ষা আর কিছুই নাই, এই উক্তি হইতেই তাঁহাদের ঐ ভাবটী সুন্দর প্রকাশ পাইতেছে।

ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে কোন কিছু বলিতে গেলে অথবা তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে উহার এই আধ্যাত্মিক দিকটী মনে রাখিতে হইবে, ভুলিলে চলিবে না। ভারতীয় সঙ্গীতকে অনেক সময়ই ভারতীয় অন্যান্য শিল্পকলার ন্যায় মূলত আদর্শোন্নত, রহস্যাবৃত, সঙ্কেতব্যক্ত ও সর্ব্বাতিশায়ী বলা হইয়া থাকে, ইহা খুবই সঙ্গত। সঙ্গীতের আধ্যাত্মিকতা ভারতবাসীর প্রাণে বৈদিক কাল অবধি এ পর্য্যন্ত এমনই

* "পঞ্চপুষ্প"—ভাদ্র, ১৩৩৮।

গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে যে,ইহার ছাপ ভারতের সর্ব্ববিধ সঙ্গীতে, এমন-কি রামপ্রসাদী, কীর্ত্তন ও বাউল প্রভৃতি দেশজ সঙ্গীতেও আমরা প্রত্যক্ষ করি। ভারতে এত প্রকার দেশজ সঙ্গীত প্রচলিত আছে যে, সে সমুদয়ের সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করা এবং তাহাদের প্রকৃতি অন্তরে ধারণ করিতে পারা আমাদের পক্ষে একান্তই অসম্ভব। ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, ভারতের বিভিন্ন প্রকার দেশজ সঙ্গীতশ্রেণীতে পার্থিব প্রেমব্যঞ্জক অনেক গান দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সকল শ্রেণীরই দেশজ সঙ্গীতের অধিকাংশ গানই ভগবৎপ্রেমমূলক বা ভক্তিমূখী।

ভগবানের দয়ায় আমরা এই আধ্যাত্মিকতাসমাচ্ছন্ন ভারতীয় সঙ্গীতরত্নের উত্তরাধিকারী হইয়া ধন্য হইয়াছি। ভারতের প্রাচীন ঋষিমুনিদিগের প্রকাশিত এই রত্নের সমুজ্জ্বল রশ্মি যুগযুগান্তরের ঘন তমসাচ্ছন্ন অন্ধকার ভেদ করিয়া আমাদের দৃষ্টিপথে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইহার জন্য প্রত্যেক ভারতবাসী গৌরব অনুভব করিবার অধিকারী সন্দেহ নাই।

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

সবে মিলে গাও তাঁহার মহিমা।
আজ কর রে জীবনের ফল লাভ।
হৃদয়-থাল-ভার, ভক্তি-পুষ্প-হার প্রভু চরণে ছাওরে ছাও।
নব-নব-রাগ-রচিত বন্দনমালা, গাঁথি গাঁথি দে উপহার।
বিশ্বাধার প্রভু সেই, যশোগীত তাঁরি প্রচার সকল সংসার॥

কথা ও সুর—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—৺কাঙ্গালীচরণ সেন।

```
      ৩          ৪       ১´        •       ২ |*     •
মপা II { মগা মা | পা -মপা I ধদা -া | -াপ মপা | -া -া | (-দমা পগা) } |
স•      বে•, মি   লে  • •   গা  •    •  ও    • •    • •  "স•"

  •      ৩       ৪         ১´      •        ২
| পমা -াপ | -গা ঋা | -গা -মা I পমা -াপ | -গা ঋা | -াস সা | -া সঋা |
 তাঁহা •   • র    •  •     মহি •    •  •    •  মা   •  আ

  ৩      ৪        ১´
| -াস সা | -া সা I সঋা -গা | -দা সা | -ঋা -া | ঋমা মাপ | -গা ঋা | -গা -মা I
  • জ    • ক    র• •     • রে    • •    জীব নে    • র    • •

  ১´
I গপা মাপ | -গা ঋা | -া সা | -া মপা II
 ফল, লা   • •    • ভ    • "স•"
```

• এই গানটিতে অন্তরা গাহিবার পর আস্থায়ীতে ফিরিয়া গিয়া যে স্থলে থামিয়া সঞ্চারী আরম্ভ করিতে হইবে, সেই স্থলের শিরোদেশে এক-দাঁড়ি চিহ্ন দেওয়া গেল।

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´

II {-া পা । পমা দা । -া না । -র্সা র্সা । -া র্সনা । র্সা -র্সা I -া দা । দা না ।

০ অ ব ০ র ০ খা ০ ল ০ ভা০ ০ র ০ ভ ক্তি, পূ

২ ০ ৩ ৪ ১´ ০ ২ ০

। র্সা র্সা । র্ঋা -া । -র্সা নর্সদা । -া পা} I পদা -া । -া পা । পা পা । দমা পা ।

০ জা হা ০ ০ ০০ ০ র প্রভু ০ ০ চ র ণে ০ ০ ছা

০ ৪ ১´ ০ ২ ০ ৩

। -া পমা । -পা পা I সা -া । -নর্সা নর্সা । -নর্সা -দা । -নর্সা নর্সা । -নর্সা -দা ।

০ ড়০ ০ রে ছা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

৪ ১´ ০ ২ ০

। নর্সা -নর্সা I নর্সদা -নদা নদা । -া পা । -া -া । দমা পগা II

০ ০ ০০ ০ ০ ও ০ ০ ০ ০ "স০"

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২ ০

II -দমা পগা । মগা মা । পা -মপা I পদা -া । -াপ পপা । -া -াপ । পমা -াপ ।

০ ০ ন ০ ব০, ন ব ০ ০ রা ০ ০ গ ০ ০ রচি ০

৩ ৪ ১´ ০ ২ ০ ৩ ৪

। -গা ঋা । -গা -মা I গমা -ঋা । -া ঋা । -াস সা । সা -াস । -ঋাস সা । -সণ্ -দ্ I

০ ত ০ ০ ০ ব ০ ন্ দ ০ ন মা ০ ০ লা ০ ০

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০

I -া সা । -া মা । -া -মা । মা -গগা । ঋা ঋা । -গা মা I গপা মাগ । -গা -ঋা ।

০ গাঁ ০ থি ০ গাঁ থি ০ ০ দে ০ ০ উ প হা ০ ০

২ ০ ৩ ৪ ১´ ০ ২ ০

। -া সা । -া মগা । মগা মা । পা -মপা I {-া পা । পমা পদা । -া না । র্সা র্সা ।

০ র ০ ন ০ ব ০, ন ব ০ ০ ০ বি শা০ ধা ০ র প্র ভু

০ ৪ ১´ ০ ২ ০ ৩ ৪

। -া র্সনা । র্সা র্সা I -া দমা । দা না । র্সা র্সা । র্ঋা -া । -ার্স র্সা । র্সদা -পা} I

০ সে০ ০ হ ০ ব০ শ, গী ০ ত জা ০ ০ ত্রি ০ ০

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০

I পদা -া । -া দা । -া র্ঋর্সা । র্সা -া । -া পদা । -া র্সা I না র্সা । নর্সদা -নদা ।

প্রচা ০ ০ র ০ স০ ক ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

২ ০

। -া পা । -দমা পগা II II

০ র ০ ০ "স০"

THE

BRAHMA SAMAJ OF INDIA

UNDER

KESHUB CHUNDER SEN.

CHAPTER III.

(4)

39. Keshub Chunder's Missionary work in the Mofussil.

On receipt of this dignified and decisive reply Keshub Chunder and his party despaired of again honestly and heartily co-operating with the *Samaj*. The step they had taken in thus provoking the resentment of the *Samaj* was not without unpleasant consequences to themselves. They soon found they were deserted and despised in the fullest sense of the words. Under these circumstances, Keshub Chunder, finding no support and sympathy in Calcutta, began in the company of some of his friends and disciples to travel from place to place in the Mofussil, preaching the tenets of the Brahmic religion, as professed by himself and his followers. These labours were attended with success in spite of the annoyances, persecutions and revilings with which they were assailed by the entire community. In the meantime Keshub Chunder had visited Madras, Bombay, and shortly afterwards the Panjab.

40. His lecture—"Christ, Europe and Asia.

When a year had thus been spent and devoted to missionary efforts, Keshub Chunder returned to Calcutta, and, in April of 1865, delivered a lecture in the theatre hall of the Medical College, entitled "Christ, Europe and Asia," in which he dwelt with great eloquence and earnestness on the life and perfections of Christ.

This speech at that time drew special attention to Keshub, and led the Christian public to believe that he was prepared to embrace Christianity—a conjecture which proved erroneous. The Brahmas too, with whom he had quarrelled evinced much pleasure at the prospect of his turning a Christian, and reviled him for his inconsistency and :apostacy. Lord Lawrence, Governor-General, who was at that time at Simla, was also so much pleased with the liberal views displayed in this speech that he desired an interview with Keshub.

41. His lecture on "Great Men."

The illusions and misconceptions which this memorable speech gave rise to were, however, quickly dissipated by another speech, entitled "Great Men," delivered a short time after. In this speech, although avowing his admiration and veneration for the great men of every age, and especially for the perfect character of Christ, Keshub undeceived the public by stating that he was prepared to go so :far, but no further. This seeming retrogression of the opinion so plainly and boldly set forth in his former speech of "Christ, Europe and Asia." excited the distrust and animosity of the whole native community. The Brahmas did not lose the opportunity of loading him with accusations, and calling him a "Christian, a Vaishnava, Chaitanyaite, and sometimes a Christian Vairagi or Vaishnava Christian."

42. Proposal to establish the "Brahmo Samaj of India."—1866 November, (1788 *Saka.*)

As some time had now elapsed since Keshub Chunder, in company with his disciples, had severed his connection with the *Samaj*, and no steps had hitherto been taken for consolidating and bringing together in one body the receding party, Keshub Chunder determind to convene a meeting for the purpose of taking into consideration the best means of cementing his party into a compact religious association. This meeting was held in November 1866 (Saka, Kartik 1788) at the Metropolitan College-House in Chitpore Road. The meeting was numerously attended. It was opened by divine service, which included some hymns, and the recital of scriptural texts extracted from the writings of Christians, Hindus, Mahomedans, Parsees, and Chinese. This extraordinary innovation was introduced to show the universal and catholic character of the proposed Church, and to invite men of all creeds and nationalities to join it. At this meeting

the following resolutions were put to the vote and unanimously carried :—

1. To establish an Association under the title of the "*Brahma Samaj of India*," for the admission of all Brahmas, and the wide propagation of the religion.

2. That this Association be bound to preserve the purity and universality of its religion.

3. That people of both sexes, believing in the fundamental principles of Brahmaism, shall be admissible as members.

4. That mottos and maxims agreeing with the principles of Brahmaism be gleaned and published from the religious writings of all nations.

5. That a vote of thanks be given to Devendranath Thakur, for the unflagging zeal he has ever exhibited, and the indefatigable labour he has undergone for promoting the progress of the religion.

From the inauguration of this religious Association dates the distinction which exists between the two *Samajes*, the one under Devendranath Thakur being called "*Adi Samaj*," or Original Church, and the one under Keshub Chunder, the "*Samaj of India*."

Thus we see, 40 years after the foundation of the *Samaj* by Ram Mohun Roy, the rise of another *Samaj* for the propagation of the same religious principles to which the Raja had devoted the best part of his life.

43. Short History of the Schism.

As the cause which led to the foundation of the *Samaj* of India have hitherto, in other words, been very incorrectly or meagrely stated, it is necessary to devote a few pages to their investigation. As stated before, the "popularly asserted" cause which gave rise to the dispute and separation of Keshub was the wearing of the "*poita*" or sacred thread by the ministers of the *Samaj*, to which Keshub objected as a relic of idolatry and Hinduism. In other words, the cause of the schism was Keshub's zeal for radical reform. To clearly understand, however, the true causes of the rupture, it will be necessary to go back a little in this history. Keshub Chunder, as we have seen, was led to join the *Samaj* through reading some of the writings of Rajnarain Bose. His joining the *Samaj* was an act of his own free will. No persuasion or coercion was used to hasten his conversion to Brahmaism. After his conversion, he conformed to all the tenets and doctrines of the religion, acquiesced to all the rules and institutes of the Church, laboured with zeal and energy in the promotion of its welfare, joined in a warm friendship with many members of the *Samaj*, and gave unhesitating obedience to the requisitions of the different offices he had held for a period of six years in the *Samaj*. He had been a missionary, then was made Secretary, and finally created Minister, in all of which capacities he had faithfully discharged his duties, and had nought to complain of. As a missionary, he had preached the doctrines of the *Samaj* ; as a Secretary, the management of the *Samaj* was in his hands ; as a minister, the devotional services of the Church were under his control.

44. Difference in Views regarding the *Poita* Or the Sacred Thread.

The wearing of the *poita* was in vogue when Keshub Chunder first joined the *Samaj*, and, during the many years he was connected with the *Samaj*, he did not object to divine service being conducted by thread-wearing Brahmas ; but when it was suddenly discovered that such a state of things was incompatible with a true and pure worship of God, arguments were not wanting to explain this change of opinion.

It was adduced that since the chief minister of the *Samaj*, Devendranath Thakur, had renounced the *poita*, it clearly showed that he was not prepared to tolerate its retention by his followers. This argument, however, does not hold good. Devendranath was not willing to make the throwing away of the *poita* a condition of Brahmaship, as he reckons the renunciation of idolatry only as an essential point for that purpose, and not that of social usages, and is of opinion that as the *poita* could be put on in an unidolatrous manner, it was merely a mark of distinction of caste. It is urged by Keshub and his party that

the relinquishing of the *poita* was essential to testify their renunciation of idolatry and Hinduism. But, if this really was the case, why has not the renunciation of the *poita* been universal among the ministers of the *Samaj of India, and all its branches in the mofussil?* Besides, that Keshub Chunder himself tolerates idolatrous rites is evident from the manner in which he married his daughter to the Maharaja of Kuch Behar, of which more anon.

Hindus of the most advanced opinions and education declare that it is an absolute impossibility for a Brahman to remove this insignia of caste from off his shoulders, so long as he is desirous of remaining with his own family, and retaining his nationality. It does not, however, come within the province of this book to discuss the absolute necessity for a Brahman to wear the sacred thread, as long as he wishes to continue a Hindu, or the needlessness of his renouncing it on embracing Brahmaism. Suffice it, however, to recall this fact that the founder of the modern Brahma religion, Raja Ram Mohun Roy, though he himself renounced all caste perjudices by going to England, still retained his sacred thread to his last moments, and went with it to the grave.

The *poita* question was really the excuse instead of the cause of the schism. Keshub's argument about the *poita* question comes to this :—that headless Brahmas were to be made ministers. Now Keshub Chunder well knew that some of his party were the only threadless Brahmas in the *Samaj,* cosequently his men were sure to succeed to the ministership of the *Samaj*.

45. Devendranath's effort at compromise—the real cause of the rupture.

As stated before, Devendranath Thakur had at first acquiesced in the demand made by Keshub Chunder to replace the *poita*-wearing Brahma ministers at the *Samaj* by the ministers who had ceased wearing the *poita*. But the old *poita*-wearing Brahmas were soon replaced, and allowed to act along with the non *poita*-wearing Brahmas. Devendranath hereby tried to harmonise the conservative and the progressive elements of the *Samaj*. This measure, together with the dismissal of Keshub from the secretaryship of the *Samaj*, were really the causes of the rupture.

46. The Civil Marriage Act of 1872 (A.D.)

To return to our narrative. A short time after the meeting at which it was determined to establish a separate *Samaj*, entitled the "*Samaj of India,*" Keshub Chunder, with some of his disciples, proceeded to Simla on a visit to Lord Lawrence, then Viceroy of India, by whom they were received with great kindness and entertained for several months. While on this visit Keshub Chunder took the opportunity of suggesting to His Lordship the necessity of promulgating an Act to legalize Brahma marriages. This Act was finally passed by the Legislative Council in 1872, much to the joy of Keshub and his party.

Although the *Samaj of India* was a *fait accompli*, as yet no church had been erected in which divine service could be held. To obviate this drawback Keshub held divine service in his own house at Kolutola till the church called the Brahma Mandir was built. At the same time Keshub and most of his followers attended every Wednesday the service of the *Adi-Brahma Samaj*. Devendranath Thakur, who then conducted divine service himself, instructed them in all the spiritual knowledge he had acquired by a long course of devotional practice. He also sometimes called at Keshub's house and taught him the best modes of divine communion and divine worship.

জীবে দয়া।

(জনৈক শিক্ষক)

ইহা বিস্তৃতভাবে বলিবার প্রয়োজন নাই যে, পৃথিবীতে মানুষের ন্যায় জীবজন্তুরও একটি বিশেষ স্থান আছে। আমরা চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেই দেখিতে পাই যে, জগতের বিভিন্ন অংশে যেমন বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ দেখা যায়, তেমনি জগতের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন জীবজন্তুরও অস্তিত্ব দেখা যায়। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, ভগবানের মঙ্গল বিধানে জগতে মানুষ

থাকারও যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনি জীবজন্তু থাকাও দরকার।

এখন আমাদের মনে সহজেই এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, জগতে জীবজন্তুর কি প্রয়োজন? আমরা অবশ্য দেখিতে পাই যে, মানুষ জগতের নানাবিধ উন্নতিজনক কর্ম্মসাধনে নিরত। তাহারই ফলে আমরা দেখি যে, আদিম মানবের সমকালীন সমাজের অবস্থা হইতে বর্ত্তমান সমাজের অবস্থা অনেক উন্নত হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝিতেছি যে, জগতের উন্নতিসাধনের জন্যই বোধ হয় মানুষের অস্তিত্ব ও পরিপুষ্টি দরকার। কিন্তু এই উন্নতিসাধনে জীবজন্তুর প্রয়োজন আছে কি না? সেই পুরাতন কাল—মানবের আদিমতম কাল অবধি বহুকাল যাবৎ মানবের একটি সংস্কার এই ছিল যে, কেবল মানবেরই ব্যবহার ও উদরপরিতৃপ্তির জন্যই বিধাতা কর্ত্তৃক জীবজন্তুর সৃষ্টি হইয়াছে। এই ভাবের উক্তি আমরা বাইবেলের পুরাতন বিধানেও দেখিতে পাই।

কিন্তু ভূতত্ত্ব প্রভৃতি নানাবিষয়ক বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আলোচনার ফলে আমরা জানিতে পাই যে, মানবজন্মের বহু সহস্র লক্ষ বৎসর পূর্ব্বেও জীবজন্তু সৃষ্টি হইয়াছিল। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, তাহাদের অধিকাংশই মানবের কোন প্রয়োজনসাধনে আসে নাই এবং আসিবার কোন সম্ভাবনাও ছিল না।

সেই সকল জীবজন্তুর বিষয় যখন আমরা পাঠ করি, তখন আমরা অবাক হইয়া যাই এবং স্তম্ভিতহৃদয়ে তাহাদের বিষয়ে আলোচনা করি। তাহারা কত আশ্চর্য্য কৌশলে তাহাদের খাদ্য সংগ্রহ করিত, তাহাদের শাবকগণকে কিরূপ প্রগাঢ়রূপে ভাল বাসিত, তাহাদের শরীর কিরূপ দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ ছিল। এই সকল ভাবিলে মস্তক স্বতই বিধাতার চরণে নত হইয়া পড়ে।

যাহাই হউক, এমন অনেক জীবজন্তু আছে, যেগুলিকে আজ বহু শতাব্দী ধরিয়া মানুষ নিজের ব্যবহারে লাগাইতেছে। সেই সকল জন্তুর মধ্যে ঘোড়া, গরু, বল্গাহরিণ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আবার এমন অনেক জীবজন্তু আছে, যেগুলি মানুষের অত্যন্ত প্রিয়পাত্ররূপে গণ্য হয়। বিড়াল, কুকুর, বানর প্রভৃতি অনেকগুলি গৃহপালিত জন্তু ইহাদের অন্তর্ভুক্ত। আবার এমনও কতকগুলি জীবজন্তু আছে, যেগুলির মাংস খাইয়া মানুষ স্বীয় উদর পূর্ত্তি করে। বিভিন্নজাতীয় মৎস্য, ছাগল, ভেড়া, মুর্গী, হাঁস প্রভৃতি জীবগুলি এই পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

ইহা সত্ত্বেও আমরা বলিব যে, জীবজন্তুর প্রতি ন্যায়ব্যবহার ও সদয় দৃষ্টি মানুষের একটি প্রধান কর্ত্তব্য। মানুষের বেলায় আমরা খুবই জোরের সঙ্গে বলি যে, পরস্পরের প্রতি ন্যায়বিচার কর্ত্তব্য এবং ন্যায়ব্যবহার পাইবার অধিকার প্রত্যেক মানবেরই আছে। আমাদের পিতামাতা, অভিভাবক বা শিক্ষাগুরু আমাদের প্রতি যতটুকু দেওয়া উচিত ততটুকু মনোযোগ যদি না দেন, তবে আমরা অন্তরে বড়ই ব্যথা পাই। কেবল এই প্রকার ন্যায়ব্যবহার কেন, আমরা তাঁহাদের নিকটে সদয় হৃদয়ের সহানুভূতিও প্রত্যাশা করি। যখন কোনও বালক রোগের যন্ত্রণায় ছটফট করিতে থাকে, তখন সে পিতামাতার নিকটে একটুখানি সহানুভূতি পাইবার জন্য কত না উৎসুকনেত্রে চাহিয়া থাকে। সেই প্রকার যখন সে কোন কারণে আনন্দে উৎফুল্ল হয়, তখনও সে পিতামাতার নিকটে একটুখানি বাহবা, একটুখানি প্রশংসা পাইবার জন্য কত না লালায়িত হয়। ইহা দেখা যায় যে, জীবজন্তুরাও মানুষের নিকট ঠিক এই রকম ন্যায়ব্যবহার ও সহানুভূতি প্রত্যাশা করে। সুপ্রসিদ্ধ আফ্রিকাপর্য্যটক ডাঃ লিভিংষ্টোনের ভ্রমণবৃত্তান্তে ইহার একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। একটি সিংহের পদতলে একটা বৃহৎ ক্ষত হইয়াছিল। সে সেই ক্ষতে ঔষধ লাগাইবার জন্য লিভিংষ্টোনের করুণদৃষ্টিপ্রার্থী হইয়াছিল।

অনেক বালক জীবজন্তু বিশেষতঃ পাখী ধরিতে বড়ই আনন্দ পায়। তাহাদিগকে নিজ নিজ শাবকাদি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনা খুবই অকর্ত্তব্য। একবার আমি এক স্থানে ভ্রমণে গিয়াছিলাম। আমার সঙ্গে এক শিকারী ছিল। মাঠে দেখি অনেকগুলি সারসজাতীয় "গেঁদালা" নামক এক শ্রেণীর পক্ষী আহারের সন্ধানে বসিয়াছিল। শিকারী বলিল "হুকুম যদি দেন তবে একটী গেঁদালা মারি—ইহার মাংস অতি সুমিষ্ট"। আমার মনশ্চক্ষে তখনই এই ছবি আসিল যে, গেঁদালাটী মারা পড়িবে, তাহার অনেকগুলি শাবক হয় তো আহার পাইবার জন্য উহার প্রত্যাশায় বসিয়া থাকিবে এবং ঐ পক্ষীটী ফিরিয়া না গেলে শাবকগুলি আহারের অভাবে মৃত্যুমুখে পড়িবে। আমি কিছুতেই গেঁদালা মারিবার আদেশ দিলাম না। এইরূপ কোন জীবজন্তুর প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিবার সময় আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত যে, তাহাদেরও শরীরে আঘাত লাগিলে তাহারাও মর্ম্মবেদনা পায়। যদি কখনও আমরা কোন জীবজন্তু পুষি তবে ইহা জানা কথা যে, তাহাদিগকে অকারণ কষ্ট না দিয়া অন্নজল প্রভৃতির দ্বারা সযত্নে তাহাদিগকে লালনপালন করিলেই আমাদের কর্ত্তব্য পালন হয়। ভারতের ঋষিমুনিরা সকল জীবজন্তুর মধ্যে প্রাণ ও মনে সমধর্ম্মিত্ব অনুভব

করিয়া জীবে দয়া ও অহিংসাকেই পরম ধর্ম্মরূপে প্রচার করিয়াছেন।

গৃহপালিত জীবজন্তুদিগকে পোষণ করিতে গেলে সহজ অবস্থায় তাহাদের আহারবিহার কিরূপ, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা আমাদের কর্ত্তব্য। তাহারা ছাড়া-অবস্থায় যে ভাবে থাকিতে ভালবাসে, প্রথম প্রথম তাহাদিগকে সেইভাবে রাখা এবং তাহাদের সহিত সেইভাবে ব্যবহার করা উচিত। আমাদের দেখা উচিত, যেন আমাদের ব্যবহারে তাহারা অকারণ কিছুমাত্র কষ্ট না পায়। কোন বালককে বালিকার উপযুক্ত পরিচ্ছদ পরাইলে অথবা পুতুলের উপযুক্ত ছাতা তাহার হাতে দিয়া রৌদ্র-বৃষ্টি হইতে তাহাকে আত্মরক্ষা করিতে বলিলে তাহার যেমন বিষম অস্বস্তি হয়, পশুপক্ষীদিগকেও তাহাদের প্রকৃতিসিদ্ধ জীবনযাত্রা হইতে কৃত্রিম আবেষ্টনে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহাদেরও সেইরূপ বিষম অস্বস্তি হয়। এই কারণে যতদূর সম্ভব তাহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে প্রাকৃতিক অবস্থার অনুরূপ করিয়া তাহারই মধ্যে তাহাদিগকে পোষণ করা কর্ত্তব্য। জীবজন্তু পুষিবার সময় আমাদের মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, সকল জীবজন্তুই গোড়ায় বন্য ছিল; কোন জীবজন্তুই গৃহপালিত ছিল না। অনেক জীবজন্তুর উষ্ণপ্রধান দেশের বনজঙ্গলে এবং অনেক জীবজন্তুর শীতপ্রধান দেশে জন্ম হয়। ইহা পর্য্যালোচনা করিয়া চিড়িয়াখানা বা পশুশালার রক্ষকগণ বিভিন্ন দেশের জীবজন্তুর জন্য বিভিন্নপ্রকার ব্যবস্থা করেন; শীতপ্রধান ল্যাপল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানের জন্তুদিগের জন্য বরফ প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন এবং উষ্ণপ্রধান দেশে জাত জন্তুদিগকে শীতপ্রধান দেশে লইয়া গেলে তাহাদের জন্য "গরম ঘর" (hot house) প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ কুকুরের বিষয় ধরা যাক,—কুকুর নেকড়ে বাঘ বা ভরক্ষুজাতীয় একপ্রকার প্রাণী হইতে নামিয়া আসিয়াছে। সকলেই জানে নেকড়ে বাঘ দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করিতে ভালবাসে। সেই সকল আদিম নেকড়েবাঘ খাদ্যের সন্ধানে দলবদ্ধ হইয়া বহুক্রোশ চলিয়া যাইত। বর্ত্তমানকালের নেকড়ে বাঘও এইরূপই করিয়া থাকে। জীববেত্তা পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, এই কারণেই কুকুর সমাজপ্রিয়, একলা থাকিতে ভালবাসে না। তাহাদিগকে ভাল রাখিতে গেলে ছুটাছুটি করিবার ও নানাবিধ উপায়ে অঙ্গচালনার যথেষ্ট অবসর দিতে হইবে। এই বিষয়টী উপলব্ধি করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, কুকুরকে শিকলে বাঁধিয়া এককোণে অনেকক্ষণ ফেলিয়া রাখিলে তাহার প্রতি কতদূর অন্যায় ও অবিচার করা হয়। যদি বা কোন কুকুরকে এইরূপে বাঁধিয়া রাখা নিতান্ত দরকার হয়, তবু অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া উচিত, যাহাতে সে দুদণ্ড হাত-পা ছড়াইয়া ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিতে পারে এবং চেঁচামেচি করিয়া খোলাপ্রাণে ডাকিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারে। কুকুর প্রভৃতিকে বাঁধিয়া রাখিবার সময় আমাদের মনে রাখা উচিত যে, যদি আমাদিগকে কেহ অন্ধকার কারাগারে পুরিয়া রাখে—নিকটে কথা কহিবার মত কোন লোকজন নাই, কাছে আহার জল প্রভৃতি কিছুই নাই, করিবার উপযুক্ত কোন কর্ম্ম নাই, তবে আমাদের মনের ভাব কিরূপ বিশ্রী হয় এবং শরীরের অবস্থা কিরূপ সঙ্গীন হয়—সর্ব্বদাই দেহের আড়ষ্ট ভাব দূর করিবার জন্য গা-হাত-পা ছড়াইবার কিরূপ চেষ্টা হয়; আমরা কিরূপ খিটখিটে হই এবং আমাদের হৃদয়ে বিপ্লবাত্মক ভাব কিরূপ ঘনাইয়া আসে।

অনেকে খরগোস পুষিতে ও পাখী পুষিতে ভালবাসেন। ইঁহারা এই সকল পশুপক্ষীদিগকে ছোট ছোট খাঁচার ভিতরে ভরিয়া রাখেন। ইঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে, ছাড়া-অবস্থায় খরগোস পক্ষী প্রভৃতি পশুপক্ষীগণ আনন্দ-উৎফুল্লপ্রাণে ঘণ্টার পর ঘণ্টা খেলাধুলা করিতে কিরূপ ভালবাসে। খরগোসেরা কচি কচি অনেক রকম শাকসবজী খাইতে বড় ভালবাসে। পাখীরাও তেমনি মাঠে গিয়া কচি কচি ধান ছোলা প্রভৃতি শস্য খাইতে খুবই ভালবাসে। এই সমস্ত আমুদে জীবজন্তুদিগকে খাঁচার ভিতর জোর করিয়া বদ্ধ করিয়া রাখা এবং তাহাদের সম্মুখে আহার্য্যের নামে কতকটা শস্যাদি ধরিয়া দেওয়া কিছুতেই সঙ্গত বলা যায় না। আমাদিগকে যদি একটা আলমারিতে বদ্ধ রাখিয়া কিছুদিনের উপযুক্ত খাদ্য সম্মুখে ধরিয়া দেওয়া হয়, তখন আমাদের মনের অবস্থা কি রকম হইবে ?

আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, অন্নবস্ত্র প্রভৃতির জন্য আমরা যেমন পিতামাতা প্রভৃতির উপর নির্ভর করিয়া থাকি, আমাদের গৃহপালিত জীবজন্তুসকলও সেইরূপ আমাদেরই উপর তাহাদের অন্নজল প্রভৃতির জন্য সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে। জীবজন্তুগণ প্রতিদিনই তাজা জলের অভাব অনুভব করে। আমাদিগকে যে দিন মলিন পাত্রে টকো দুধ দেওয়া হয়, কিংবা শুকনো ধুলাকাদায় ভরা ও মাছি-বসা খাবার দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমাদের মনের অবস্থা যে রকম হয়, মলিন পাত্রে কাদাঘোলা জল দিলে বা বাসী খাবার

দিলে তাহাদেরও মনের অবস্থা কতকটা সেই রকম হয় —আমরাও দেখিয়াছি যে তাহারা এই রকম খাবার অনেক সময় ফেলিয়া দেয় এবং এই প্রকার জল স্পর্শও করে না।

অনেকেই জানে যে ঘোড়াকে সদয় ব্যবহারে কি রকম বশীভূত করা যায়। বালকেরা তাহাদের পাঠ্য অনেক গ্রন্থে আরব্য ঘোড়ার কথা পড়িয়াছে নিঃসন্দেহ। যুদ্ধক্ষেত্রে আহত এক সৈনিককে তাহার আরব্য ঘোড়া কিরূপে মুখে ধরিয়া স্বগৃহে ফিরাইয়া আনিয়াছিল, ঘোটক-বিষয়ক প্রায় সকল গ্রন্থেই ইহা উল্লিখিত হইতে দেখা যায়। ঘোড়ার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলে উহা কিরূপ বিগড়াইয়া যায় এবং কোন প্রকার শাসন মানিতে চাহে না, তাহার বহু দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করা যায়। সেইরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার অশ্বপালকদিগের নিষ্ঠুর হৃদয়ের পরিচয় মাত্র। অনেক ছেলে ঘোড়ায় চড়িতে ভালবাসে বটে কিন্তু ঠিকমত চালাইতে না জানিয়া লাগাম বড়ই জোরে টানিয়া ধরে এবং তাহার ফলে ঘোড়া না চলিলে অন্যায়রূপে তাহার পৃষ্ঠে বড়ই বেশী চাবুক মারিতে থাকে। বালকদিগকে এই প্রকার নিষ্ঠুর ব্যবহারের অনিষ্টকারিতা ভালরূপে বুঝাইয়া দেওয়া প্রত্যেক অভি-ভাবকের কর্ত্তব্য। কেবল মানুষ নহে, সকল জীবজন্তুর প্রতি সদয় ব্যবহার করিলে তাহারাও যে সহজে বশীভূত হয় এবং তাহাদের নিকটে অনেক কাজ সহজে পাওয়া যায়, এ বিষয় বালকদিগের মনে শিক্ষাগুরুদের ভালরূপে অঙ্কিত করিয়া দেওয়া উচিত। আমাদের দেশে একটি চলিত প্রবাদ আছে যে, অহিংসাযোগে সিদ্ধ যোগীমুনিগণের নিকট হিংস্র ব্যাঘ্রাদি জন্তুগণও স্বীয় হিংসাবৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক বশীভূত হইয়া থাকে। ঘোড়া সদয় ব্যবহার কিরূপ বুঝিতে পারে এক ইংরাজ লেখক তাঁহার গ্রন্থে তাহার একটী দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া-ছেন। একটি ঘোড়াকে এক পাহাড়ের উপর বোঝাই-পূর্ণ একটী গাড়ী টানিতে দেওয়া হইয়াছিল। ঘোড়াটী কিছুদূর গিয়া আর টানিতে না পারায় থামিয়া গেল। এই ঘোড়ার মনিব ঘোড়াটীকে বড়ই ভাল বাসিতেন। তিনি ঘোড়াটীর পিঠ চাপড়াইয়া এবং তাহাকে অনেক আদরের কথা বলিয়া সেই পাহাড়ের উপরে উঠিবার জন্য আর একটিবার চেষ্টা করিতে বলিলেন। ঐ ঘোড়াটী মনিবের কথাগুলি যেন বেশ বুঝিতে পারিল। তখন সে তাহার সমস্ত বল দিয়া প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া সেই বোঝাই গাড়ী পাহাড়ের শিখরদেশে টানিয়া উঠাইল এবং তাহার ফলে সে প্রাণত্যাগ করিল। বলা বাহুল্য, মনিব তখন অন্তরে ঘোড়াকে স্বহস্তে হত্যা করিবার বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন।

পশুপক্ষী পুষিতে গেলে যতদূর সম্ভব তাহাদের ভাষা ও মনের ভাব বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত। তাহাদের মনের ভাব, তাহাদের দুঃখ ও সুখ, হর্ষ ও বিষাদ বুঝিবার চেষ্টা করা আমাদের কর্ত্তব্য বলিয়া জানিতে হইবে। আমরা বাল্যকাল অবধি শিখিয়া আসিয়াছি যে পশু-পক্ষীরা "বোবা"—কারণ তাহারা মানুষের মত কথা বলিতে পারে না; কিন্তু একথা ঠিক নয়, তাহাদের ভাষা আছে এবং তাহাদের মনের ভাব প্রকাশ করিবার ক্ষমতাও যথেষ্ট আছে। আমরা তাহাদের মনের ভাব ও ভাষা বুঝিবার চেষ্টা করি না বলিয়াই আমরা উহা বুঝিতে পারি না। আমরা বাল্যকালে সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম, এক ইংরাজপর্য্যটক একটী লৌহপিঞ্জর নির্ম্মাণ করিয়া আফ্রিকার এক ভীষণ জঙ্গলে উহা লইয়া গিয়া নানাবিধ পশুপক্ষীর ভাষা বুঝিবার জন্য আপনি উহার মধ্যে কয়েকমাস বাস করিয়াছিলেন। পশুপক্ষীর ভাষা ও ভাব বুঝিতে গেলে এইরূপ সহৃদয়ভাবে ও ধৈর্য্য সহকারে ঐ বিষয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত। তাহারা তাহাদের মনের ভাব বুঝাইবার জন্য কত বিভিন্নভাবে চীৎকার করে এবং মাথা ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কত রকমে সঞ্চালিত করে, তাহা বলা যায় না। আমরা সে সকলের দিকে একটুও মনযোগ দিই না, সুতরাং তাহদের মনের ভাবও বুঝিতে পারি না।

পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের এক সাধু পুরুষ সেণ্ট ফ্রান্সিস যে অরণ্যে বাস করিতেন, সেই অরণ্যের পশুপক্ষী-দিগকে তাঁহার "ভাইভগ্নী" বলিয়া অভিহিত করিতেন। কথিত আছে, বনের পক্ষীরা তাঁহার নিকট বসিয়া নানাবিধ গান গাহিত। জীবজন্তুদের প্রতি সদয় ব্যবহার করিলে খুবই শীঘ্র তাহারা উহা বুঝিতে পারে। আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র পূজ্যপাদ দ্বিজেন্দ্রনাথ পশুপক্ষী-দিগের প্রতি সদয় ব্যবহার প্রকাশ করিবার ফলে কাঠ-বিড়াল প্রভৃতি জন্তু ও চড়াই প্রভৃতি পক্ষীগণ নির্ভয়ে তাঁহার দেহের সর্ব্বত্র বিচরণ করিত এবং তিনি উহাতে বড়ই আনন্দ পাইতেন। সেদিন শুনিলাম যে বিহারদেশীয় এক সুপ্রসিদ্ধ জমীদার এক সাধু পুরুষের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ সাধু তাঁহাকে অন্যান্য উপ-দেশের মধ্যে এই উপদেশ বিশেষভাবে দিয়াছিলেন যে, তিনি যতদিন অহিংসাভাব হৃদয়ে পোষণ করিবেন, ততদিন তিনি শত শ্বাপদসঙ্কুল গহন অরণ্যে প্রবেশ করিলেও ব্যাঘ্রাদি কোন হিংস্র জন্তু তাঁহাকে মুহূর্ত্তের জন্যও স্পর্শ করিবে না। এই গল্পটী সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, কিন্তু যে সন্ন্যাসীপুরুষের নিকট ইহা

শুনিয়াছিলাম, তিনি আমাকে উক্ত গুরু ও জমীদার এবং সম্মুখে একটী সুবৃহৎ ব্যাঘ্র উপবিষ্ট এই প্রকার একটী ফটোচিত্র আমাকে দেখাইয়াছিলেন। অহিংসার ফলে সর্প ব্যাঘ্র প্রভৃতি অতীব ক্রূর ও হিংস্রক জন্তুদিগকে বশীভূত করিবার অনেক গল্প ও কথা আমাদের দেশে, বিশেষত সাধুসন্ন্যাসীদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে ইহা জানা কথা। আমাদের যোগশাস্ত্রে অহিংসা দ্বারা হিংসা জয় করা সত্য বলিয়া কথিত আছে।

শিবিরপ্রত্যাগতদিগের জন্য প্রার্থনা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

[বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পর বিভিন্ন শ্রেণীর বঙ্গসেনা গঠিত হইয়াছিল। তাহাদিগের অনেকগুলি বিদেশে গিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে বিশেষ কৃতকৃত্যতা দেখাইয়া আসিয়াছিল। বর্ত্তমানে সেই সকল সেনামণ্ডলীর অনেক-গুলি উঠিয়া গিয়াছে। যেগুলি অবশিষ্ট আছে, তাহাদিগকে সময়ে সময়ে নগরের বাহিরে গিয়া শিবিরবাসী হইয়া কুচ্‌কাওয়াজ করিতে হয়। ইংরাজ প্রভৃতি জাতির মধ্যে এইরূপ শিবিরবাসী সেনামণ্ডলী, শিবির হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইলে তাহাদিগের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবার একটী সুমঙ্গল রীতি প্রচলিত দেখা যায়। সেই রীতি অনুসরণ করিয়া আমাদিগের দেশবাসী শিবিরপ্রত্যাগত সেনামণ্ডলীদিগের জন্য একটী প্রার্থনার আদর্শ নিম্নে দিলাম]।

হে মঙ্গলময় বিধাতা! আমাদের যে সকল বন্ধুবান্ধব দেশের কল্যাণ সাধনের জন্য সেনামণ্ডলীভুক্ত হইয়া কুচ্‌-কাওয়াজের জন্য বিদেশে যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে তুমি নির্ব্বিঘ্নে ও নিরাপদে আমাদিগের মধ্যে ফিরাইয়া আনিয়াছ, এইজন্য আমরা তোমাকে কৃতজ্ঞতাভরে বার বার নমস্কার করি।

মুক্ত গগনের চন্দ্রাতপের নিম্নে শ্বাপদসঙ্কুল গহন অরণ্যের মধ্যস্থিত সঙ্কীর্ণ পথসমূহে ইহাঁদিগকে সর্ব্বদাই বিচরণ করিতে হইত; গভীর নিশীথে একমাত্র চন্দ্রমার স্নিগ্ধজ্যোতিই দীপস্বরূপ হইয়া ইহাঁদিগকে পথপ্রদর্শনে সহায়তা করিত। ইহাঁরা আত্মীয়স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়া সুদূরবর্ত্তী স্থানে যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেখানে তুমিই রক্ষক হইয়া ইহাঁদিগকে নানাপ্রকার বিঘ্নবিপত্তি হইতে সর্ব্বদাই রক্ষা করিয়া আসিয়াছ। তোমারই প্রসাদে ইহাঁরা সেই অজানা স্থানেও অন্ন-জলের সংস্থান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। প্রভাতে ব্রহ্মমুহূর্ত্তে যখন ইহাঁদিগকে জাগ্রত করিবার জন্য ঘণ্টা বাজিয়া উঠিত এবং শিঙ্গাসকল নিনাদিত হইত, তখন ইহাঁরা ত্বরিতবেগে শয্যাত্যাগ করিয়া নানাবিধ ব্যায়ামের সাহায্যে শরীরের দৃঢ়তা সাধন করিতেন। তৎপরে ইহাঁরা সমস্ত দিবস ধরিয়া কুচ্‌-কাওয়াজের পর আকাশে সন্ধ্যাতারা প্রকাশ পাইলে শিবিরে ফিরিয়া আসিতেন। এই সকল বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে ইহাঁরা যে অক্ষতশরীরে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তাহার জন্য আমরা তোমার চরণে কৃতজ্ঞতানিবেদনের উপযুক্ত ভাষা খুঁজিয়া পাই না। ইহাঁদের অন্তর হইতে দ্বেষ-হিংসা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার কুভাব উৎপাটিত করিয়া দাও। ইহাঁদিগকে দেশের কল্যাণকামনায় পরিপুষ্ট কর এবং দয়া মৈত্রী প্রভৃতি সর্ব্ববিধ সাধুভাবে পরিবর্দ্ধিত কর। ইহাঁদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ-কলহ যেন স্থান না পায়। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত ইহাঁদিগের সখ্যবন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়া দাও।

তুমি যে ইহাঁদের এবং আমাদের সকলের মধ্যে সাধুবৃত্তিসকল অর্জ্জনের উপায়স্বরূপে বুদ্ধি ও বল, জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রেরণ করিয়াছ, তজ্জন্য আমরা তোমাকে ভক্তিভরে বারবার নমস্কার করি।

হে ভগবান! আমরা তোমার কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, আমাদের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের মধ্যে যাঁহারা দেশের আহ্বানে শিক্ষাশিবিরে বা যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যেখানেই যান না কেন, তাঁহাদের যেন উপযুক্ত আহারের এবং সুস্বাদু জলের অভাব না হয়, দেহের উপর অস্ত্রাঘাত হইলে তাঁহাদের চিকিৎসার যেন ত্রুটী না হয়। তুমি তাঁহাদের রক্ষক হইয়া তাঁহাদিগকে সকল বিপদ আপদের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিও। তাঁহাদের উপর তোমার মঙ্গল আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিও; যাহাতে তাঁহারা তাঁহাদের জীবন, কি বাহিরে কি গৃহে এমনভাবে পরিচালিত করেন যে, তাঁহাদের সেই জীবন দেখিয়া উত্তরবর্ত্তী লোকেরা গৌরব সহকারে তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে পারেন। দেশরক্ষাব্রতে ব্রতী হইয়া, আমরা যেন সকল অবস্থাতেই ও সকল সময়েই, কি জীবনে, কি মরণে, তোমারই প্রসন্নমূর্ত্তি দেখিয়া ধন্য হই।

ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ।

(স্বামী সদানন্দ)

ব্রাহ্মসমাজকে পুনরুদ্দীপ্ত করিতে হইলে সকল শাখার সমবেত চেষ্টা আবশ্যক। যখন ব্রাহ্মসমাজ নবীন উদ্যমে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিল, সে সময়ে দেশে ধর্ম্মের অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। নানাপ্রকার সংকীর্ণতা, কুসংস্কারাদি আসিয়া দেশের ধর্ম্মজীবনকে নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ করিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু আজ ভারতের সকল ধর্ম্মসমাজ মধ্যেই এক নবযুগের অভ্যুত্থান হইয়াছে। সকল ধর্ম্মসমাজই আপন আপন ধর্ম্ম হইতে কুপ্রথা, কুসংস্কার, সংকীর্ণতা প্রভৃতি বহিষ্কৃত করিয়া সংস্কারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। নবযুগের আলোকে সকল সম্প্রদায়ই অল্লাধিক আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং এখন আমাদিগকে পূর্ব্বকার কার্য্য-প্রণালীরও সময়োচিত পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইয়াছে।

একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না যে, আমাদের মধ্যে দলাদলি এবং গোঁড়ামিই ব্রাহ্মসমাজের মহা অনিষ্ট করিয়াছে। এই দলাদলির ভাব যতদিন না দূরীভূত হইবে, ততদিন সমাজের মঙ্গল হইতে পারে না; বরং দিন দিন এই কঠিন ব্যাধি যক্ষ্মারোগের ন্যায় সমাজকে ক্ষীণ, মলিন ও হীনপ্রভ করিয়া ফেলিবে। তাহার পর যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহাই ঘটিবে।

ব্রাহ্মসমাজের হিতাকাঙ্ক্ষীগণের মধ্যে অনেকেই ইহা বুঝিয়াছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, এখনও এই বিষম ব্যাধির চিকিৎসার বিশেষ কোন বন্দোবস্ত হইতেছে না। ইহার নেতাগণ অভ্যাসের দাসত্ব বশতঃ এই দলাদলির প্রভাব এখনও অতিক্রম করিতে পারিতেছেন না। এই দলাদলির ভাব যে কতদূর তাঁহাদের হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা আমরা অনেক সময় প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। নেতাগণের এই অবস্থা দেখিয়া মফঃস্বলের অনেক ব্রাহ্ম মর্ম্মাহত হইয়াছেন। তাঁহাদের সকল উদ্যম, সকল উৎসাহ নিরাশার স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। অনেক কর্ম্মবীর বিশেষতঃ উৎসাহী ব্রাহ্ম যুবক ক্ষুব্ধ ও নিস্তেজ হইয়া নীরবে মনের দুঃখ মনেই চাপিয়া রাখিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই বিশ্বাস যে, যতদিন এই সকল সঙ্কীর্ণহৃদয় নেতাগণ বিদ্যমান থাকিবেন, ততদিন ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি হওয়া অসম্ভব।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অনেকে আদিব্রাহ্মসমাজের স্কন্ধে সকল দোষ চাপাইয়া দিয়া আপনাদিগের দোষক্ষালনে. চেষ্টা করিতেন। কিন্তু গত কয়েক বৎসর ধরিয়া আদি-সমাজ যে অভাবনীয় উদারতা দেখাইয়া আসিতেছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। সমবেত ব্রহ্মোপাসনা প্রভৃতি কার্য্যে আদিসমাজের নীরব হস্ত প্রসারিত ছিল, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। যে যে মুখ্য কারণ দর্শাইয়া ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি স্বতন্ত্র সমাজ গঠিত করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে প্রায় সকলগুলিই এখন অন্তর্হিত হইয়াছে। তথাপি এখনও যে আদিব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে অন্যান্য শাখার নেতাগণের মতের বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা মনে হয় না। তার পর যে কোন কারণেই হউক না কেন, নববিধানসমাজ ও সাধারণব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যে মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল, তাহা এখনও অনেক পরিমাণে বর্ত্তমান রহিয়াছে। গত শতবার্ষিক উৎসবের সময় ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় ব্রাহ্মসমাজের পুনরুত্থানের চেষ্টা যে বাধাসঙ্কুল হইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি?

প্রকৃতপক্ষে এখনও তিনটি সমাজ যেন তিনটি পৃথক্ জাতিতে পরিণত রহিয়াছে। ইহার ভবিষ্যৎ ফল যে কি হইবে, তাহা ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেক হিতৈষীরই চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক। সমাজের আভ্যন্তরীণ কার্য্য-প্রণালীতে মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু সেজন্য দলাদলির ভাব পোষণ করা যে কতদূর অসঙ্গত, তাহা কাহারও দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। দলাদলির আবরণ পরিয়া আমরা না হয় কোনক্রমে আমাদের জীবন অতিবাহিত করিতে পারিব; কিন্তু এই ভাব স্থায়ী হইতে দিলে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের অবস্থা যে কি হইবে, তাহা ভাবিবার কি এখনও সময় আসে নাই?

আমি এই একটী প্রস্তাব করিতেছি যে, তিন সমাজের বিশিষ্ট সভ্যগণকে লইয়া একটী সঙ্ঘ গঠিত করা হউক। এই সঙ্ঘের দ্বারা সকল সমাজের মধ্যে মৈত্রীভাব আনয়ন করিয়া যাহাতে ব্রাহ্মসমাজ নবজীবন লাভ করে, তাহার উপায় উদ্ভাবন করা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে কিছু চেষ্টাও করা হইয়াছিল, কিন্তু বিশেষ ফল হয় নাই। বলা বাহুল্য যে, তিন সমাজের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা স্থাপন হইলে সমবেত কার্য্য করিবার পথ পরিষ্কার হইতে পারে।

আমার দ্বিতীয় প্রস্তাব এই যে, তিন সমাজের মধ্যে আচার্য্যের অদল-বদল করা। আদিব্রাহ্মসমাজ অন্যান্য সমাজের আচার্য্যদিগকে বেদীগ্রহণে আহ্বান করিয়া এবিষয়ে পথ অনেকটা প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে। আশা করি, এই মিলনের চেষ্টাকে সফল করিতে তিন সমাজ সমবেতভাবে সচেষ্ট হইবে।

আপনাপন সমাজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াও যে এক-যোগে কার্য্য করিতে পারা যায়, তাহা খৃষ্টীয় সম্প্রদায় আমাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজের মধ্যেও অনেক সম্প্রদায় আপনাপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াও একযোগে কার্য্য করিয়া থাকেন। তবে ব্রাহ্মসমাজ কেন পারিবে না ?

অনেকে ভাবিয়াছিলেন যে, গত শতবার্ষিক উৎসবের সময় তিন সমাজের এই প্রকার মিলন সাধিত হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, কয়েকজনের সহানুভূতির অভাবে সে আশা ফলবতী হয় নাই। সম্মিলিত উৎসবাদিতে একত্র মিলিত হইলেও অনেকের মন হইতে অমিলের ভাব সম্পূর্ণ বিদূরিত হয় নাই।

যাহা হউক, এখন অবধি যাহাতে সকল সমাজের মধ্যে আন্তরিক মৈত্রীভাব আনয়ন করিতে পারা যায়, সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমি প্রত্যেক ব্রাহ্ম ভ্রাতাকে এসম্বন্ধে একটু বিশেষ চিন্তা করিতে অনুরোধ করিতেছি। আশা করি, আমার এই অনুরোধ ব্যর্থ হইবে না। মঙ্গলময় পরমেশ্বর আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন।

দেবমন্দিরে প্রবেশনিষেধ।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আমরা মধ্যে মধ্যে সংবাদপত্রে দেখিয়া আসিতেছি যে, ভারতের অনেক স্থানে অস্পৃশ্য বলিয়া অনেক জাতিকে দেবমন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। ইহার ন্যায় বিভিন্ন জাতিগণের মধ্যে মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষ উপস্থিত করিবার কোন কিছু আছে কিনা সন্দেহ। মহাত্মা গান্ধি এই অস্পৃশ্যতা দুর করিবার চেষ্টায় মনপ্রাণ নিয়োগ করিয়াছেন বলিয়া তিনি আমাদের নমস্য। সম্প্রতি সংবাদপত্রে দেখিলাম, কটকজেলার অন্তর্গত জগৎসিংপুর থানার অধীনস্থ বাউলপুর গ্রামে কুম্ভকারদিগকে অস্পৃশ্য বলিয়া তথাকার দেবমন্দিরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। ইহার প্রত্যুত্তরে কুম্ভকারেরাও ব্রাহ্মণাদি উচ্চতর জাতিদিগকে তাহাদের প্রস্তুত হাঁড়ি প্রভৃতি বিক্রয় করিবে না বলিয়া সত্যাগ্রহ করিয়াছে। কবে এই পরস্পরবিদ্বেষের ভাব দূরীভূত হইবে, তাহা মঙ্গলময় বিধাতাই বলিতে পারেন। কিন্তু ইহা ঠিক কথা যে, এই প্রকার জাতিবিদ্বেষ দূরীভূত না হইলে আমরা যতই কেন স্বাধীনতা পাই না, দেশের সুশৃঙ্খলা ও শান্তি আনয়ন করা নিতান্তই দুরূহ হইবে।

কিরূপ সামান্য কারণে এই জাতিবিদ্বেষ ভীষণ-ভাব ধারণ করিতে পারে, তাহার একটি দৃষ্টান্ত একবার আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। বনিত্তো নামক একটি গ্রাম জগন্নাথ-ক্ষেত্রের বিশ ক্রোশের অন্ত-র্ভুক্ত। তথায় পশ্চিমেশ্বর মহাদেব নামক একটি বহুদিনের পুরাতন শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই পশ্চিমেশ্বর জগন্নাথদেবের অংশ বলিয়া পুজিত হন। উক্ত গ্রামে বাউরী নামক এক জাতিকে অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয় শূদ্রাধম বলিয়া ধরা হয়। বায়ুসঞ্চালিত বস্ত্র দ্বারা বা প্রত্যক্ষ দেহ-সংযোগে উহাদের সহিত উচ্চতর কোন জাতির সংস্পর্শ ঘটিলে সদ্য সদ্য জাতিচ্যুতি ঘটে। একবার তথায় দুই জাতিভ্রাতার মধ্যে বিবাদ ঘটিয়াছিল। উভয়েই পরস্পরকে জব্দ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। ইতিমধ্যে এক-দিন এক ভারবাহক বাঁকে করিয়া এক ভ্রাতার জল লইয়া যাইতেছিল। সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, অপর ভ্রাতার দলস্থ লোক রটাইয়া দিল যে, ঐ জলের কলসে এক বাউরীর বস্ত্রের খুঁট লাগায় ঐ জল অস্পৃশ্য হইয়াছিল। কিন্তু উহা ভ্রমক্রমে বিরোধীয় ভ্রাতা কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হওয়ায় তাহার জাতিচ্যুতি ঘটিয়াছে। এইবার দলাদলি খুব পাকিয়া উঠিল। সমস্ত গ্রামটী দুই দলে বিভক্ত হইল। চাষ-আবাদ প্রভৃতি সকল প্রয়োজনীয় কার্য্যই বন্ধ হইয়া রহিল। এই সংবাদ শুনিয়া আমি তথায় গিয়া পড়িলাম।

উক্ত গ্রামটী আমাদের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত। আমি কয়েকজন কর্ম্মকুশল ও আমার মতসমর্থক কর্ম্মচারী সঙ্গে লইয়া গেলাম। আমি করুণার্দ্র হৃদয়ে পশ্চিমেশ্বর মহাদেবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তারস্বরে "ওঁ পিতা নোঽসি" প্রভৃতি বেদমন্ত্রে ভগবানের অর্চ্চনা করিয়া উভয় দলের নেতৃবৃন্দকে সম্মুখে উপস্থিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এই পাশ্চমেশ্বর মহাদেবের ক্ষেত্র জগন্নাথদেবের বিশ-কোশী ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত কিনা ?"

উত্তর। হাঁ।

প্রশ্ন। জগন্নাথদেবের পুণ্যক্ষেত্রে জাতিভেদ মানা পাপ কিনা ?

উত্তর। হাঁ, পাপ।

এইরূপ প্রশ্নোত্তরের পর তাহাদিগকে দলাদলি ভাঙ্গিবার অনুরোধ করিলে দলাদলি সহজেই ভাঙ্গিয়া গেল। অস্পৃশ্যতা কিরূপ শূন্যগর্ভ ভিত্তির উপর দণ্ডায়-মান, তাহাই দেখাইবার জন্য আমি এই বিষয়টীর উল্লেখ করিলাম।

অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে আর একটি কথা সর্ব্বদাই আমার মনে হয়। এদেশের চলতি কথা এই যে, সৃষ্টিকর্ত্তার

মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উদর হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে। অবশ্য ইহার শাস্ত্রোক্ত ভিত্তি আছে। শাস্ত্রীয় উক্তি পড়িলেই বুঝা যায় যে, উহা অক্ষরশঃ ধরিবার জন্য উক্ত হয় নাই। বলিতে গেলে চতুর্ব্বর্ণের কার্য্যবিভাগ অর্থাৎ কার্য্যবিভাগের ফলে চাতুর্ব্বর্ণ্যের যথাযুক্ত উৎপত্তি বুঝাইবার জন্যই শাস্ত্রে উহা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু সেই কারণে যে শূদ্রদিগের স্পৃষ্ট অন্ন অস্পৃশ্য ও অখাদ্য হইবে, এমন কথা কোথাও উক্ত হইয়াছে বলিয়া জানি না। গুণকর্ম্মবিভাগ অনুসারে চাতুর্ব্বর্ণ্য রক্ষা করিবার কথা যাহা ভগবদ্গীতায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা আমাদের মত সম্পূর্ণ সমর্থন করে। মনুসংহিতার একস্থানে শূদ্রদত্ত অন্ন সাধারণতঃ অখাদ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু এই শ্লোক যদি প্রক্ষিপ্ত বলিয়াও ধরা না যায়, তথাপি ইহা বলিলে কিছুমাত্র অসঙ্গত হইবে না যে, সেই সময়ের অবস্থাবিবেচনায় মনুসংহিতা ঐ কথা বলিয়াছেন। সে সময়ে সম্ভবতঃ আর্য্য ও অনার্য্যদিগের মধ্যে বিষম বিরোধ চলিয়া আসিতেছিল। খাদ্যদ্রব্যে শূদ্র বা অনার্য্যগণকে কখন্ অন্নে বিষ প্রদান প্রভৃতি নানা উপায়ে আর্য্যগণের অনিষ্ট করে এই আশঙ্কায় যে-সে শূদ্রের হস্ত হইতে অন্নগ্রহণ নিষেধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শূদ্রদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। (১) যাহারা আর্য্যদিগের অনুগত বা সৎশূদ্র, এবং (২) যাহারা অননুগত। এই অননুগত শূদ্রদিগের সম্বন্ধেই স্মৃতিগ্রন্থে নিষেধবিধি জারি করা হইয়াছে। যদি সকল শূদ্রই সত্য সত্য অনাচরণীয় হইত, তবে কোন সময়েই—এমন কি, মৃত্যুসঙ্কটেও চণ্ডালের অন্নভক্ষণের বিধান মনুসংহিতার ন্যায় সর্ব্বমান্য স্মৃতিগ্রন্থে উল্লিখিত হইত না।

ভাবিয়া দেখিলে অস্পৃশ্যতার অসারতা সহজেই বুঝা যাইবে। ভগবানেরই চার অঙ্গ হইতে যদি চার বর্ণের উৎপত্তি হইয়াই থাকে, তবে কে কাহাকে অস্পৃশ্য বলিতে পারে? ভগবানের মুখও যেমন পবিত্র, তাঁহার বাহুও তেমনি পবিত্র; তাঁহার বাহুও যেমন পবিত্র, তাঁহার উদরও তেমনি পবিত্র; তাঁহার উদরও যেমন পবিত্র, তাঁহার পদও তেমনি পবিত্র। কাজেই জিজ্ঞাস্য এই যে, কাহার এমন অধিকার আছে যে, ভগবানের যে কোন অঙ্গ হইতে উৎপন্ন কোন জাতিকে অস্পৃশ্যবোধে দূরে ঠেলিয়া রাখিতে পারে? অধিকার না থাকিলেও ভারতবাসী এই পাপ করিয়া আসিতেছে বলিয়া ভারতের কিরূপ অবনতি ও সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে, তাহা চক্ষুষ্মান ব্যক্তিকে বুঝাইয়া দিতে হইবে না। এই ছুঁৎমার্গ দেশ হইতে যত শীঘ্র বিতাড়িত হয়, ততই দেশের মঙ্গল।

নিম্নজাতিসমূহকে অন্যান্য ব্যবহারস্থলে যদি বা অস্পৃশ্য ধরা যায়, তথাপি দেবতার মন্দিরে তাহাদিগের প্রবেশনিষেধ অপেক্ষা অন্যায়, অসঙ্গত ও দ্রোহাকর্ষক আর কিছুই হইতে পারে না। ইহার ফলে ঐ সকল অস্পৃশ্য জাতিদিগের অন্তরে স্ব-স্ব সমাজ পরিত্যাগের কথা জাগিয়া উঠে এবং কাজেই তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য সমাজবন্ধনও শিথিল হইবার উপক্রম হয়। যতদিন ধর্ম্মের নামে সাম্প্রদায়িক ভাব দেশবাসীর মনে বদ্ধমূল থাকিবে, ততদিন এই ছুঁৎমার্গ বিদূরিত হওয়া সম্ভবপর হইবে বলিয়া মনে হয় না। হিন্দুধর্ম্মের যাহা সার, সকল ধর্ম্মের যাহা সার, সেই সত্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেই সর্ব্ববিধ সাম্প্রদায়িক ভাব এবং তৎসঙ্গে ছুঁৎমার্গ প্রভৃতি অনাচার-কদাচারসমূহও যে অচিরে অন্তর্হিত হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

গ্রন্থপরিচয়।

সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াদ্ এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥

স্বাধীনতার পথ—শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ৯নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, সরস্বতী লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত।

গ্রন্থখানি শ্রীযুক্ত বার্ট্রাণ্ড রাসেলএর Roads to Freedom গ্রন্থের সার সংকলন বলিয়া লেখক অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু ইহাকে আমরা একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিতে পারি। বস্তুতঃ ইহা socialism তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত সার বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। যাঁহারা বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতিবিষয়ে আলোচনা করিতেছেন, তাঁহাদিগের ইহা বিশেষ সহায়তা করিবে। ইহাতে তাঁহারা জানিবার ও ভাবিবার অনেক বিষয় পাইবেন। গ্রন্থকার তাঁহার নিবেদনে সাম্যবাদের যে অর্থ করিয়াছেন 'প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ শক্তিবিকাশে পূর্ণ অবসর ও সুযোগলাভ করিবে', এই অর্থের সহিত আমরা সম্পূর্ণ সায় দিতে পারি; কিন্তু যে সাম্যবাদে 'মুচি-মিছরির দর এক করা হয়' অর্থাৎ উচ্চনীচভেদ সম্পূর্ণ উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করা হয়, সে সাম্যবাদের অর্থ ঠিক বুঝিতে পারি না। বোধ হয় "বিপ্লবী রুশিয়া"ও এই অর্থে সাম্যবাদের পক্ষপাতী নয়। কারণ সেখানেও দেখা যায় যে, শ্রমিকগণের উপযুক্ততা অনুসারে বেতনাদির উচ্চনীচ হার নির্দ্দিষ্ট করা হইতেছে। আমরা গ্রন্থোক্ত মতের সহিত সম্পূর্ণ একমত না হইতে পারিলেও রাষ্ট্রনীতিতে নিমগ্ন দেশবাসী মাত্রকেই ইহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

বিপ্লবী রুশিয়া—শ্রীযুক্ত সৌম্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রণীত ও শ্রীনরেন্দ্র চন্দ্র বর্দ্ধন কর্ত্তৃক ১৯৪।৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

আজ কয়েক বৎসর হইল শ্রীমান্ সৌম্যেন্দ্রনাথ শ্রমিকদলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক প্রকার বলিতে গেলে আপনাকে এদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছেন। তিনি সেই অবধি আজ কয়েক বৎসর যাবৎ জার্ম্মাণী এবং রুশিয়ার শ্রমিকগণের সহিত বাস করিয়া তথাকার বর্ত্তমান রাষ্ট্রপরিচালনার যে সকল তত্ত্ব সাক্ষাৎভাবে অবগত হইয়াছেন, তাহারই কয়েকটী আলোচ্য গ্রন্থে তিনি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থে তাঁহার দরিদ্র শ্রমিকদিগের প্রতি প্রীতি পরিস্ফুট হইয়া পড়িতেছে। গ্রন্থে পাঁচটী বিষয় বিবৃত হইয়াছে। ঐ পাঁচটী বিষয় পড়িলে বর্ত্তমান রুষিয়ার ভিতরকার প্রকৃত ছবি চক্ষের সম্মুখে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইবে। গ্রন্থকারের পরিপাটি লিখনভঙ্গী এই চিত্রাঙ্কনে খুবই সহায়তা করিয়াছে। বর্ত্তমান রুশিয়া সম্বন্ধীয় যে সকল গ্রন্থ আমরা পাঠ করিয়াছি, তাহা হইতে আমরা এটুকু দেখি যে, তাহাদের অধিকাংশ রচয়িতাই ভারতের প্রাচীন সমাজগঠনের তত্ত্ব আলোচনা করিবার অভাবে দাসমনোভাবের জালে পড়িয়া নবতর সোভিয়েটবাদের চাকচিক্যে আত্মসংবরণে অক্ষম হইতেছেন।

ভারতের অবিকৃত প্রাচীন সমাজগঠনে Capitalism ও Communism এই উভয়ের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছে। আমরা যতই পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের কম্যুনিজম ও সোভিয়েটবাদ আলোচনা করিতেছি, ততই আমাদের দৃঢ়প্রতীতি হইতেছে যে, ইহারা সকলেই পরিণামে দেশকালঅবস্থা অনুসারে যথাযুক্ত পরিবর্ত্তন সহকারে মানববৃত্তিসমূহের স্বাভাবিক সমন্বয়ের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ভারতের ঐ প্রাচীন সমাজ গঠনধারার অভিমুখে অগ্রসর হইবে। মনুষ্যসমাজ যেমন কেবল ধনী, জ্ঞানী, প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে লইয়াই চলিতে পারে না, সেইরূপ কেবল শ্রমিক প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিগণকে লইয়াও চলিতে পারে না। উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানে সমাজের প্রকৃত উন্নতি ও মঙ্গল। ভারতের কল্পিত বর্ণাশ্রমের ভিতরেই এই সামঞ্জস্য সুন্দর পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য গ্রন্থে সোভিয়েট রাশিয়ায় যে প্রকার শিক্ষাবিধানের ব্যবস্থা দেখিতেছি, বলিতে গেলে, তাহা কেন্দ্রীভূত আকারে গুরুগৃহে বাসমূলক ভারতের প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতিতে দৃষ্ট হইবে। যাঁহারা নবতর রুশিয়ার প্রকৃত ছবি দেখিতে ইচ্ছা করেন এবং তাহার বর্ত্তমান রীতিনীতির সহিত ভারতের রীতিনীতির তুলনা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে আমরা শ্রীমান্ সৌম্যেন্দ্রনাথের "বিপ্লবী রুশিয়া" এবং শ্রীযুক্ত নলিনী গুপ্ত মহাশয়ের "বলশেভিকী" এই দুইখানি গ্রন্থ মিলাইয়া পাঠ করিতে অনুরোধ করি। "বিপ্লবী রুশিয়া"র শিক্ষারীতিতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, রুষিয়ার বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রকাশ্যে অপরিণতবুদ্ধি ছাত্রগণের উপর কর্ত্তৃত্ব প্রদান করিলেও বস্তুতঃ সমস্ত রুশিয়া জাতির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নিশ্বাসরোধপূর্ব্বক দমনাপনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ইহার ফল কখনই ভাল হইতে পারে না। ইহার পরিণামে আমরা দিব্যচক্ষে দেখিতেছি আর একটী ভীষণ বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী।

ব্রহ্মবিদ্যা—শ্রীদেবেন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী বিবৃত। প্রাপ্তিস্থান ৯বি, রামতনু বসু লেন।

গ্রন্থকার কঠোপনিষদের যম-নাচিকেতসংবাদকে সোঽহংবাদের ভিতর দিয়া দৃষ্টি করিয়া ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রয়াস নিতান্ত নিষ্ফল হয় নাই। গ্রন্থের ভিতর তর্কসাপেক্ষ অনেক বিষয় এবং সংস্কৃত ঔপনিষদ মন্ত্রের অধিক প্রক্ষেপ না থাকিলে গ্রন্থখানি অধিকতর সুখপাঠ্য হইত বলিয়া মনে হয়। যাই হউক, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পথে গমনেচ্ছু ব্যক্তিগণের এই গ্রন্থ যে বিশেষ সহায়তা করিবে, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

ভারতের সাম্যবাদ—শ্রীসতীশ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রণীত। মূল্য আট আনা। প্রাপ্তিস্থান খাদি প্রতিষ্ঠান। ১৫, কলেজ স্কোয়ার।

এই গ্রন্থের পরিচয় দিতে গিয়া দুঃখে অশ্রু উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে। গ্রন্থকার এক বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। গ্রন্থ পাঠ করিয়া বুঝা যায় গ্রন্থকার কার্য্যে ও ব্যবহারে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ নীতির একান্ত অনুবর্ত্তী। তিনি বর্ণাশ্রমধর্ম্মমূলক সমাজনীতির ভিতর দিয়া কৃষি ও চরকারূপ দুই যন্ত্রের সাহায্যে সাম্যবাদমূলক রাষ্ট্রনীতিতে পৌঁছিতে চাহেন। বর্ণাশ্রমকে তিনি জাতিগত করিতে চাহেন বা গীতোক্তভাবে গুণকর্ম্মবিভাগজনিত করিতে ইচ্ছা করেন? সাম্যবাদ অর্থে তিনি ঠিক কিরূপ নীতি প্রচার করিতে চাহেন, গ্রন্থে তাহার সামান্য আভাস পাইলেও তাহার সম্পূর্ণ অবয়ব আমরা ঠিক ধরিতে পারিলাম না; এই দুইটী বিষয় তিনি আর একটু বিশদভাবে বুঝাইলে ভাল হয়। আমাদের বিবেচনায় বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে জাতিগত গণ্ডীর মধ্যে সম্পূর্ণ আবদ্ধ রাখিলে বর্ত্তমান যুগে ভীষণ ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য

করিয়া বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে হিন্দুজাতি নিজের আসন কিছুতেই অটুট রাখিতে পারিবে না। সাধারণতঃ কোন জাতীয় ব্যবসায় বংশানুক্রমে নামিয়া আসিলে তাহার উৎকর্ষসাধন অধিকতর সম্ভব বটে; কিন্তু যদি সেই বংশের কোন ব্যক্তির অন্য কোন কর্ম্মে মাথা খুলিয়া যায়, তবে তাহাকে জাতিগত বর্ণধর্ম্মের কারণে বলপূর্ব্বক তাহার বংশগত ব্যবসায়ে ধরিয়া রাখা বোধ হয় কিছুতেই সঙ্গত হইবে না। গ্রন্থকার গীতোক্ত স্বধর্ম্ম ও পরধর্ম্ম সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, আমরা তাহার সহিত সম্পূর্ণ একমত হইতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত। মোটামুটি বলিতে গেলে আমরা গ্রন্থকারের সহিত এ কমতে বলিতে পারি যে, ভারতে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের উপর (অবশ্য গুণকর্ম্মবিভাগজ হইলে) যে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত, সেই সাম্যবাদ যে কোন দেশ, যে কোন জাতি অবলম্বন করিবে, সেই দেশ ও সেই জাতির মধ্যেই শান্তি সু-প্রতিষ্ঠিত হইবে। কৃষি ও চরকার ন্যায় ভারতে স্বাবলম্বন আনিবার শ্রেষ্ঠতর পন্থা যে দ্বিতীয় নাই, এবিষয়েও আমাদের মতদ্বৈধ নাই।

ক্ষি, না, ঠা.

রামপ্রসাদ—ধর্ম্মমূলক পঞ্চাঙ্ক নাটক। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান চাতরা শ্রীরামপুর। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

ভক্ত রামপ্রসাদ-চরিত্র বাঙ্গালীর পরম শ্রদ্ধার বস্তু। তাঁহার জীবনকথা লইয়া এই নাটকখানি রচিত। নাটকের অনেকস্থান গিরিশচন্দ্রের অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। ভক্তিরসের প্রাচুর্য্যে রচনা স্থানে স্থানে বেশ সরস ও মধুর হইয়া উঠিয়াছে। কিছু কিছু ছন্দপতন আছে। এই নাটকের রামপ্রসাদ ও ভজহরি পরজন্মে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দরূপে পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, এই অভিনব সংবাদটী নাট্যকার কোথা হইতে পাইলেন জানি না। সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "ভক্ত রামপ্রসাদ" পড়িয়া গ্রন্থকার এই নাটক লিখিয়াছেন। গ্রন্থকারের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের গুণে নাটকখানি প্রায় সর্ব্বত্রই সুখপাঠ্য হইয়াছে।

যো. চ. চৌ.

কিশোরী—সচিত্র বার্ষিকী। শ্রীসুধাদেবী বি-এ বি, টি, এল, টি, ডি, সম্পাদিত। মূল্য ২৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান ২০৪নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট।

গ্রন্থখানি সুন্দর বাঁধা, সুন্দর কাগজ ও সুন্দর ছাপা। ইহাকে আমরা পত্রিকার আসনে না বসাইয়া একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থের আসন দিতে প্রস্তুত। গ্রন্থখানি কিশোর-কিশোরীদের উপযুক্তই হইয়াছে। তাহাদিগের কৌতুহল তৃপ্ত করিবার অনেক বিষয় ইহাতে আছে। কবিতাগুলিও সুনির্ব্বাচিত হইয়াছে। ইহাতে অনেকগুলি মনোগ্রাহী চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়া ইহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। ইহাতে রাণী রাসমণির কয়েকটী জীবন-কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সেগুলি আমাদের বড়ই মিষ্ট লাগিয়াছে। তন্মধ্যে তিনি তীর্থযাত্রার জন্য আয়োজন করিয়া যেই শুনিলেন যে বঙ্গে দুর্ভিক্ষ লাগিয়াছে, তখনই তিনি তাঁহার তীর্থযাত্রা পরিত্যাগ করিয়া তজ্জন্য সংগৃহীত অর্থ দুর্ভিক্ষনিবারণের জন্য দান করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। এই ঘটনাটী কেবল বর্ত্তমান কালের জন্য নহে, সর্ব্বকালেই উল্লেখযোগ্য বলিয়া ইহার উল্লেখ করিলাম। কেবল "নক্সা" প্রবন্ধে গুটিকয়েক Expression যাহা দেওয়া হইয়াছে, তাহা না দিলেই ভাল হইত। কিশোর-কিশোরীগণ এই গ্রন্থে তাঁহাদের অনেক শিক্ষণীয় বিষয় পাইবেন।

জলছবি—শ্রীহিরণ্ময় সেন প্রণীত। ২২।৫বি, রামাপুকুর লেন হইতে শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা।

ইহা একখানি সামাজিক উপন্যাস। লেখকের ভাষার উপর কিছু দখল আছে বটে কিন্তু যে ভাবের উপর তিনি গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন, আমরা সেই ভাবের কিছুতে সমর্থন করিতে পারি না। গ্রন্থের নায়িকা বর্ত্তমান কালের উপযোগী সেমিজ, জ্যাকেট ও সাড়ী প্রভৃতি পরিচ্ছদ যতদিন পরিধান করিত ততদিন তাহার চরিত্র কলুষিত ছিল; আর যখনই সে ঐরূপ পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া শুধু সাড়ীর উপরেই নির্ভর করিল, তখনি তাহার চরিত্র কলুষমুক্ত হইল! এইরূপ ধারণা আদৌ সমর্থনযোগ্য নহে। গ্রন্থকার উচ্চ আদর্শ সম্মুখে ধরিয়া গ্রন্থ লিখিলে নিশ্চয়ই সফলকাম হইবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

ক্ষি, না, ঠা.

ভাগবত-ধর্ম্ম—দ্বিতীয় ভাগ। শ্রীশ্যামলাপ্রসাদ মল্লিক বি-এ ভাগবতরত্ন বৈষ্ণবসিদ্ধান্তভূষণ প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রাপ্তিস্থান সরকার বিশ্বাস এণ্ড কোং, ২নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য ১৲ টাকা।

এই গ্রন্থের প্রথম ভাগ আমরা পাই নাই। কিন্তু তজ্জন্য দ্বিতীয় ভাগের রসগ্রহণে কোন বাধা হয় নাই। গ্রন্থকর্ত্তার সহিত সমুদয় স্থলে আমরা একমত না হইলেও গ্রন্থটী পাঠ করিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। যাঁহারা বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের এই পুস্তক বিশেষরূপ সাহায্য করিবে সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থপাঠে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হয়। কুব্যাখ্যা শ্রবণের ফলে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধাবান্ প্রত্যেককে আমরা এই গ্রন্থপাঠের অনুরোধ করি।

ইহাতে পাঠক দেখিবেন যে, প্রত্যেক ধর্ম্মের ন্যায় বৈষ্ণব ধর্ম্মের লক্ষ্যও কত সুন্দর—আদর্শও কত উচ্চ।

ক্ষে. না, ঠা.

য়েরোড়া জেলের অভিজ্ঞতা।—শ্রীমোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী প্রণীত "য়েরোড়ার অনুভব" হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত কৃত বঙ্গানুবাদ। মূল্য—৷৷৹ আট আনা। ডবল ক্রাউন আকারের ৩৶৹+১৪৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

গান্ধীসাহিত্যের পবিত্র ভাবধারাকে বাঙ্গালা সাহিত্যে বহমান করিয়া এবং উহা স্বল্পমূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া দেশমাতৃকার প্রিয় সন্তান শ্রীসতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয় বাঙ্গালীমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ইঁহার "প্রতিষ্ঠানগ্রন্থাবলী"র মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর প্রায় সকল পুস্তকেরই বঙ্গানুবাদ স্থান পাইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থের অনুবাদ এত সুন্দর হইয়াছে যে, মহাত্মাজীর নিজের লেখাই পড়িতেছি বলিয়া ভ্রম হয়। গ্রন্থখানির নামই ইহার পরিচয় প্রদান করিতেছে। অসহযোগ আন্দোলনের প্রবর্ত্তক হিসাবে রাজদ্রোহ অপরাধে ১৯২২ সালে মহাত্মাজীর যখন সুদীর্ঘ ছয় বৎসরের কারাবাস হয়, তখন তাঁহাকে প্রায় দুই বৎসর "য়েরোড়া" জেলে আবদ্ধ থাকিতে হইয়াছিল। মহাত্মাজীর অমূল্য জীবনের এই দুই বৎসরের অভিজ্ঞতা আলোচ্য গ্রন্থখানিতে স্থান পাইয়াছে। তেরটী বিভিন্ন পরিচ্ছেদে মহাত্মাজী তাঁহার স্বভাবসুলভ অন্তর্দৃষ্টির সহিত বর্ত্তমান কারাগারের দোষগুণের আলোচনা করিয়া ইহার ভাবী-সংস্কারের ইঙ্গিত করিয়াছেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে কারাগৃহে অবস্থানকালে সরকারের সহিত সত্যাগ্রহীর কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য, তাহাও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। "আমার পড়া" শীর্ষক তিনটী পরিচ্ছেদ আমাদের খুব ভাল লাগিয়াছে। যে সকল মনীষীবৃন্দ দেশের শ্রদ্ধার পাত্র, তাঁহারা যদি তাঁহাদের অধ্যয়নকালের এমনি এক-একটী সুন্দর বিবৃতি প্রদান করেন, তবে উহা গ্রন্থারণ্যে দেশবাসীর দিগ্‌দর্শনশলাকার কার্য্য করিবে। মহাভারতাদি গ্রন্থের সহিত গিবনের ইতিহাসের তুলনায়, হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আলোচনায় তিনি আমাদিগকে অমূল্য উপদেশ দান করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে মহাত্মাজীর সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং "পরিশিষ্টে" জেলকর্ত্তৃপক্ষের সহিত তাঁহার যে চিঠিপত্রের আদানপ্রদান হইয়াছিল, তাহা স্থান পাইয়াছে। উপসংহারে এই কথাটী বক্তব্য যে, "য়েরোড়া" নামটী ইংরাজী উচ্চারণের মধ্যস্থতায় আমাদের নিকট "যারবেদা" নামে পরিচিত।

স্নেহের দাবী।—শ্রীনিখিরাজ হালদার প্রণীত। মূল্য—১।৹ আনা।

১৬ পেজী ডবল ক্রাউন আকারের ১৬৹ পৃষ্ঠায় একখানি নাতিদীর্ঘ সামাজিক উপন্যাস। ব্যর্থ প্রেমের হতাশায় বিবাহবিমুখ বিশ্বেশ্বর বৃদ্ধা পিসীমাতার মৃত্যুশয্যায় তাঁহার স্নেহের দাবী হিসাবে অকালে লোকান্তরিত বন্ধু নিখিলের পালিতা ভগিনী রাণীকে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। এই ক্ষুদ্র ঘটনাটীকে কেন্দ্র করিয়া নবীন লেখক বিবিধ ভাবে ভাষায় ও ভঙ্গিমায় এই আলেখ্যখানি অঙ্কন করিয়াছেন। গ্রন্থে "কাঁচা হাতের ছাপ" দেখা গেলেও নবীন গ্রন্থকারের এই প্রথম উদ্যম প্রশংসনীয়।

মৃচ্ছকটিক।—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা। মূল্য এক টাকা। প্রাপ্তিস্থান ১২৭ হরিশ মুখার্জ্জি রোড।

সংস্কৃতসাহিত্যে "মৃচ্ছকটিকম্" কবিপ্রবর রাজা শূদ্রক-বিরচিত একখানি খ্যাতনামা নাট্যগ্রন্থ। ইহাই বোধ হয় সংস্কৃত ভাষার একমাত্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সামাজিক নাটক। মহাকবি ভাস খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকে "চারুদত্ত" নামে একখানি চতুরঙ্ক ক্ষুদ্র নাটক লিখিয়াছিলেন। ইহাই পরবর্ত্তী যুগে কবিপ্রবর রাজা শূদ্রকের অমর লেখনীসম্পাতে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া "মৃচ্ছকটিকম্" নামে খ্যাত হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থখানি কবিপ্রবর রাজা শূদ্রকের পদাঙ্কানুসরণে খাঁটি অনুবাদ না হইলেও উহারই সুন্দর বঙ্গীয় ভাবানুবাদ। বঙ্গীয় পাঠকের রুচির অনুসরণে মূলের রস অক্ষুণ্ণ রাখিয়া লেখক ইহাতে যে গীতযোজন ও স্থানে স্থানে দৃশ্যসংরচন করিয়াছেন, তাহাতে ইহার উৎকর্ষই সাধিত হইয়াছে এবং সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির অভিপ্রায়ে তাঁহার এই স্বাধীনতা অবলম্বনে সত্যই তিনি রাজা শূদ্রকের পদাঙ্কানুসারীই হইয়াছেন। আজকাল ইংরাজী নাট্যরূপের অনুকরণেই বাঙ্গালা সাহিত্যে নাটক রচিত হইয়া থাকে। ঘটনাবাহুল্যই ইংরাজী নাটকের মারফাতে বাঙ্গলা নাটকেও স্থান পায়; কিন্তু সংস্কৃত ভাষার নাট্যরূপ ভিন্ন প্রকৃতির—অন্তর্গূঢ় রসধারাই তাহার প্রাণ। কেবল এই 'মৃচ্ছকটিক' ও মহাকবি ভাসরচিত নাটকগুলিতেই ইংরাজী নাটকের মত ঘটনাবাহুল্যের সমাবেশ দৃষ্ট হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রের মারফতে প্রাচীন ভারতের যে তপঃপূত পুণ্যচিত্র অঙ্কনে আমরা অভ্যস্ত, তাহার সহিত সমসাময়িক কবি-অঙ্কিত এই সুন্দর আলেখ্যখানির কোথায় কতটুকু যোগাযোগ তাহার আলোচনা ও গবেষণায় নানা রহস্যের দ্বারোদ্ঘাটন হইবার সম্ভাবনা।

দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ—শ্রীমোহনদাস কর্মচাঁদ গান্ধী প্রণীত। মূল গুজরাটি হইতে শ্রীসতীশ চন্দ্র দাসগুপ্ত কৃত বঙ্গানুবাদ। মূল্য ১৲ টাকা। ডবল-ক্রাউন আকারে ৮০+৪৩০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

মহাত্মা গান্ধী যারবেদা-জেলে বসিয়া এই দক্ষিণ "আফ্রিকায় সত্যাগ্রহের" ইতিহাস লিখিয়াছিলেন; সতীশ বাবুও আলিপুর-জেলে বসিয়া ইহার বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। মহাত্মাকে যাহা মহাত্মা করিয়াছে, সেই সত্যাগ্রহের উৎপত্তি, পরিণতি ও প্রয়োগের অপূর্ব্ব ইতিহাস ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। ইহা দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয়দিগের যথাযুক্ত অধিকারলাভের জন্য দীর্ঘ কালব্যাপী অহিংস সংগ্রামের সুন্দর ইতিহাস। সত্য শাশ্বত বলিয়া যাহা তিনি একদিন দক্ষিণ-আফ্রিকার কর্ম্মক্ষেত্রে লাভ করিয়াছিলেন, আজ তাহাই ভারতের বৃহত্তর-ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতেছেন। সত্যাগ্রহ বস্তুটা কি, তাহার প্রকৃত পরিচয় অনেকেরই জানা নাই। এই গ্রন্থে তাহার নির্দ্দেশ মিলিবে। সত্যাগ্রহ ইউরোপে আবিষ্কৃত "প্যাসিভ্ রেজিষ্ট্যান্স" নহে, কিন্তু ইহা বহুযুগ পূর্ব্বে পশুবলের বিরুদ্ধে ভারতের ধর্ম্মপূত অন্তর হইতে আবিষ্কৃত একটা মহান্ সত্য। এই সত্য "ধিক্ বলং ক্ষাত্রবলং ব্রহ্মতেজো-বলং বল" এই বজ্র বাণীতেই সুব্যক্ত হইয়াছে। মহাত্মার জীবনে ভারতের এই অতীত অবদানই সত্যাগ্রহ-মূর্ত্তিতে বিকশিত। ইহা যে শক্তিমান্ প্রতিপক্ষকে বিরক্ত বা জব্দ করিবার জন্য গৃহীত হয় না, পরন্তু অসীম কষ্টসহিষ্ণুতার মধ্য দিয়া স্বীয় অন্তরের প্রচ্ছন্ন আত্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য অবলম্বিত হয়, এই গ্রন্থে মহাত্মাজী তাহা সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন।

সু. চ. চৌ.।

খাদ্যতত্ত্ব—ঢাকা গবর্ণমেন্ট মেডিকেল স্কুলের শিক্ষক বিধুভূষণ পাল এল, এম, এস প্রণীত। ডবল ক্রাউন আকারের ॥+১৮৭ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

আমাদের বর্ত্তমান স্বাস্থ্যহীনতার যত প্রকার কারণ আছে, তাহাদের মধ্যে খাদ্যবিষয়ক অনভিজ্ঞতাই প্রধান কারণরূপে গণ্য হইতে পারে। ক্ষুধা পায়, তাই আমরা খাই; কিন্তু আহারের উদ্দেশ্য যে কেবল ক্ষুন্নিবৃত্তি বা রসনার পরিতৃপ্তি নয়—শারীরিক ক্ষয়পূরণ ও পুষ্টিসাধনও বটে, সেকথা আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই। কিরূপ খাদ্য কাহার পক্ষে কোন্ অবস্থায় কতখানি আবশ্যক, সে বিষয়ে আমাদের কোন জ্ঞান নাই বলিলে হয়; ফলে অনেক সময় পুষ্টির পরিবর্ত্তে ক্ষয় বৃদ্ধি পায়। সুতরাং দেহকে সুস্থ ও সবল রাখিতে চাহিলে খাদ্যবিষয়ে জ্ঞানসঞ্চয় প্রত্যেকেরই অবশ্যকর্ত্তব্য। অথচ আমাদের দেশে এবিষয়ের গুরুত্বের অনুপাতে যথাযুক্ত আলোচনার অভাব দৃষ্ট হয়। বহুকাল গত হইল ডাক্তার চুনিলাল বসু মহাশয় "খাদ্য"নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তদবধি এপর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় এবিষয়ে আর কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ চোখে পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ডাক্তার বিধুভূষণ পাল মহাশয়ের খাদ্য-বিষয়ক অবশ্যজ্ঞাতব্য বহু তথ্যে পূর্ণ আলোচ্য গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা পরম পরিতৃপ্ত হইলাম। আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি, পরিপাক ক্রিয়ায় তাহা শরীরস্থ নানাবিধ প্রভাবে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হইয়া কতক আমাদের অঙ্গীভূত হয়, আর কতক দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। মানবশিশুর জন্মকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত সকল সময়ের খাদ্যবিধি ইহাতে আধুনিক আহারবিজ্ঞান অনুসারে আলোচনা করা হইয়াছে। পুস্তকটি যাহাতে কেবল সাধারণেরই উপযোগী না হইয়া চিকিৎসাবিদ্যার্থীগণেরও সহায়ক হয়, লেখক সে বিষয়ে যত্নের ত্রুটী করেন নাই। এই কারণে গ্রন্থখানি ন্যূনাধিক বৈজ্ঞানিক ভাবে ও ভাষায় লিখিত হইয়াছে। আশা করি, বঙ্গদেশে ইহার সমাদর হইবে।

জ্ঞা. না. ব.।

সংবাদ।

বেহালা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব।—গত ৩০শে কার্ত্তিক সোমবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের অষ্টসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক উৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রাতঃকালে উপাসনার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ। সুরেশচন্দ্রের উদ্বোধন ও স্বাধ্যায়ান্তে শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত একটী সুন্দর উপদেশ বিবৃত করেন। অপরাহ্নে সার্দ্ধ তিন ঘটিকার পর শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বে সমবেত সুগম্ভীর কণ্ঠে "পারায়ণ" অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া বেহালা উৎসবের বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়। সুগায়ক শ্রীমাণিকলাল দে মহাশয় সদলবলে ব্রহ্মসংকীর্ত্তন করিয়া সমবেত উপাসকগণের অন্তরে আনন্দ প্রদান করেন। সন্ধ্যায় শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য

শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম-এ ও পণ্ডিত প্রবর শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য বেদান্ততীর্থ মহাশয়ত্রয়কে সঙ্গে লইয়া বেদীগ্রহণ করেন। হেমেন্দ্রবিজয় বাবু কবিত্বময় উদ্বোধনে সমবেত উপাসকগণকে প্রবুদ্ধ করিলেন। সর্ব্বশেষে সুরেশচন্দ্র "বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম" বিষয়ে একটী উপদেশ বিবৃত করেন। সমাজমন্দিরটী সন্ধ্যায় শ্যাম পত্রপুষ্পলতায় ও শোভন দীপমালায় সুন্দর সুসজ্জিত হইয়াছিল। সর্ব্বশেষে চিন্তামণি বাবু উপস্থিত জনবৃন্দকে জলযোগ করাইয়া আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।

গার্হস্থ্য সংবাদ।

জাতকর্ম্ম—গত ১৫ই অগ্রহায়ণ সোমবার পূর্ব্বাহ্ণ ৮॥০ ঘটিকায় স্যর ৺আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের জামাতা ডাক্তার শ্রীমান উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী পি-এইচ-ডি মহাশয়ের নবকুমারের জাতকর্ম্ম তদীয় ৯নং সানি পার্কের বাসভবনে পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থের পৌরোহিত্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথপ্রবর্ত্তিত পদ্ধতি অনুসারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ভগবান নবকুমারকে নিত্য আশিষ্ঠ দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ করিয়া তুলুন।

সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ—গত ১৮ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার পূর্ব্বাহ্ণ ১০॥০ ঘটিকায় সাধু ৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অন্যতম জামাতা ৺অভয়কুমার মজুমদারের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র ডাঃ শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার এম-এ, পি-এইচ-ডি, বার-এট-ল মহাশয় কর্ত্তৃক ৩২নং আণ্টনিবাগানের তদীয় ভবনে পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থের পৌরোহিত্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের একেশ্বরবাদসম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে।

শোকসংবাদ।

মহামহোপাধ্যায় ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—গত ১লা অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার রাত্রি একাদশ ঘটিকার সময় স্বনামধন্য পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি-আই-ই, এম-এ, ডি-লিট মহাশয় তাঁহার পটলডাঙ্গাস্থ বাসভবনে পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে ইহাঁর বয়ঃক্রম অষ্টসপ্ততি বৎসর অতিক্রম করিয়াছিল। নৈহাটী গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ ভট্টাচার্য্যবংশে ইহাঁর জন্ম। ইহারই অদূরে কাঁটালপাড়া বঙ্কিমজন্মভূমি। হরপ্রসাদ সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যজীবনেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার প্রভায় আকৃষ্ট হইয়া সাহিত্যিক জীবন বরণ করেন। সংস্কৃত, ইংরাজী ও বাঙ্গালা এই ভাষাত্রয়ে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি যুগপৎ বঙ্গভাষা বাঙ্গালী ও ভারতবাসীর কল্যাণের কারণ হইয়াছিল। সাহিত্য-রচনায়, ইতিহাসসংগ্রহে, পুরাতত্ত্ব আবিষ্কারে ও বিদ্যা-বিতরণে তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভা চিরদিন তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। বৌদ্ধশাস্ত্রেও তিনি বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। ফরাসী, জার্ম্মান, তিব্বতীয় পালি প্রভৃতি ভাষায়ও তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। ইহাঁর মৃত্যুতে বাঙ্গালার তথা ভারতের বিদ্বৎসমাজের যে অঙ্গহানি হইল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। ইহাঁর শোকার্ত্ত পুত্রপরিজন ও আত্মীয়বন্ধুদিগকে আমরা আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

দানপ্রাপ্তি।

ডাঃ শ্রীউপেন্দ্রনাথ চৌধুরী পি-এইচ-ডি তদীয় নবকুমারের জাতকর্ম্ম উপলক্ষে আদিব্রাহ্মসমাজে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে উহার প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি।

শতাধিকদ্বিতীয় সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব।

আগামী ১১ই মাঘ সোমবার প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় আদিব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে বিশেষ ব্রহ্মোপাসনা হইবে। অতএব ঐ দিবস যথাসময়ে উক্ত গৃহে সকলের উপস্থিতি সাদরে প্রার্থনীয়।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।